শিল্প দর্শন ও সাহিত্য সমালোচনা

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
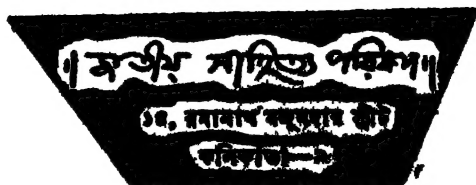
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের জীবন ও রচনাপরিচিতি

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমালোচনার ক্ষেত্রে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের নাম সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কিভাবে মানুষ অতি সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে সমাজের উচ্চতম স্থানে আরোহণ করতে পারে ডঃ ভট্টাচার্যের জীবন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পিজলিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল অমৃতলাল ভট্টাচার্য এবং মাতা ছিলেন মহামায়া দেবী। অতি শৈশবেই পিতামাতাকে হারাবার পরে তাঁর জ্যাঠাইমা ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী তাঁকে লালন পালন করেন। জ্যাঠাইমার কোনো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু তাঁর বুকজোড়া স্নেহের নিরাপদ আচ্ছাদনে সাধনকুমারকে ঘিরে রেখেছিলেন। সেজন্য শৈশব ও কৈশোরে দারিদ্র্যের চরমতম আঘাত সহ্য করেও কোনো দিন অন্তরের দৈন্য তিনি বোধ করেন নি। জ্যাঠাইমার স্নেহের ঋণ কখনও তিনি ভুলতে পারেন নি। জ্যাঠাইমার কথা বলবার সময় কৃতজ্ঞতায় তাঁর অন্তর বিগলিত হ'য়ে যেত। তিনি তাঁর কয়েকখানি বই জ্যাঠাইমার নামে উৎসর্গ করেছিলেন। দমদম ক্যান্টনমেণ্টের সুভাষনগরে অবস্থিত তাঁর নিজস্ব বাড়িটির নামও জ্যাঠাইমার স্মৃতিজড়িত ক'রে রেখেছেন।

সাধনকুমারের শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল গ্রামের পাঠশালাতেই। পরে কাশিয়ানী গিরিশচন্দ্র হাইস্কুলে পড়েছিলেন এবং ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বহুদিন আগে পিছনে ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি

কোনো দিন তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই তাঁর মুখে তাঁর গ্রামের দিনগুলির কথা প্রায়ই শোনা যেত—শৈশব ও কৈশোরের স্নেহ-ভালবাসা মাখানো বহু স্মৃতি তাঁর অন্তরে নানা করুণ রাগরাগিণী জাগিয়ে তুলত, খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের বহু সঙ্গী সাথীর সঙ্গে তাঁর মানসিক বিচ্ছেদ কোনো দিন ঘটেনি। গ্রামে থাকতেই তাঁর অভিনয়ে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল এবং গ্রামের থিয়েটারে তিনি ছিলেন একজন প্রশংসিত অভিনেতা। পরবর্তীকালে গ্রামের সঙ্গে তাঁর সামান্যই যোগ ছিল, কিন্তু নাগরিক জীবনের শতপ্রকার কৃত্রিমতার মধ্যে বাস করেও তিনি তাঁর গ্রাম্য মানসিকতা কোনো দিন ছাড়তে পারেন নি, বাহ্য ব্যবহার ও আচরণে তিনি একজন গ্রামের মানুষই শেষ পর্যন্ত ছিলেন। তাঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনধারণ প্রণালী, অকপট আন্তরিকতা এবং অনাবৃত মনোভাব দেখে তাঁকে বরাবর একজন গ্রামের মানুষ বলেই মনে হত।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কলেজে পড়বার জন্য এলেন কলকাতায়। এক সদাশয় পরিবারে থেকেই কলেজে পড়াশুনা করতেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে আই. এ. এবং ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। নানারূপ মানসিক অশান্তির জন্য পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এরপর ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম. এ. পাশ করেন এবং ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় এম. এ. পাশ করেন বাংলায়।

সাধনকুমারের অধ্যাপকজীবন শুরু হয় পাটনা বি. এন. কলেজে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে যশোহর মাইকেল মধুসূদন কলেজে যোগদান করেন। তাঁর পরবর্তী মননশীল সমালোচক জীবনের সূচনা হয় এই কলেজে কাজ করবার সময়ে। কলেজে ও কলেজের বাইরে একটি মননশীল বুদ্ধি-জীবী গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ফলে তাঁর মধ্যে অধ্যয়ন-স্পৃহা এবং বিতর্ক ও বিচারের বৃত্তি উন্মেষিত হয়।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে সাধনকুমার বঙ্গবাসী কলেজের বাংলার অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কিছুকালের মধ্যেই কৃতী অধ্যাপকরূপে তাঁর

নাম ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবাসী কলেজে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এক একখানি বাংলা নাটক অবলম্বনে সুবিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করলেন। চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, প্রফুল্ল, রক্তকরবী, নূরজাহান, নীলদর্পণ, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সম্পর্কে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ক'রে যেতে লাগলেন। এই সমানোচনাগুলিই 'নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার' নামে পাঁচ খণ্ডে সংকলিত হয়। পরবর্তীকালে নবপরিকল্পনায় ওই সমালোচনাগুলি 'জাতীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে পুনঃ প্রকাশ করবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সমালোচনায় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটেছে। নৈয়ায়িকের ন্যায় তীক্ষ্ণ যুক্তিপরম্পরা বিস্তার ক'রে এবং প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অত্যধিক নৈয়ায়িক ভঙ্গির জন্য তাঁর রচনারীতি হয়তো জায়গায় জায়গায় অস্বচ্ছ হয়েছে এবং বিতর্কমূলক তির্যক ভঙ্গির জন্য ভাষাও হয়তো কিছুটা প্রাঞ্জলতা হারিয়েছে। কিন্তু তবুও সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি আবেগবর্জিত, বুদ্ধিপ্রধান ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

অধ্যাপনা ও নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন অন্যদিকে তেমনি তত্ত্ব-আলোচনার প্রতি অধিকতর প্রবণতা দেখালেন। তার ফলে রসবিশ্লেষণের ক্ষেত্র থেকে তাঁর স্থান সম্প্রসারিত হল তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স অনুবাদ করে তিনি অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ ভিত্তি করে সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা করেন এবং অনুবাদ ও তাঁর নিজস্ব আলোচনা 'অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ত্ব' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ওই গবেষণাগ্রন্থের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল উপাধিতে ভূষিত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি পাশ্চাত্য জগতের অপর দুজন ক্লাসিক তত্ত্বাচার্য হোরেস ও লঙ্গাইনুসের সাহিত্যতত্ত্ব (Ars poetica ও On the Sublime) বাংলায় অনুবাদ করেন। বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদের আহ্বানে

তিনি নানা নাট্যশাস্ত্রীর মত উদ্ধৃত করে নাটকীয়তার লক্ষণ বিচার করলেন 'নাটক ও নাটকীয়ত্ব' নামক প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন 'রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের ভূমিকা' নামক গ্রন্থে। ওই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসমসাময়িক সমাজ-মানসের বিবর্তন সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডঃ ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষের যুগ্ম সম্পাদনায় 'একাঙ্ক সঙ্কলন' নামে প্রথম একাঙ্ক সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ওই গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁরা একাঙ্ক নাটকের রূপ ও রীতি নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করলেন।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য নাটক সঙ্গীত একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে ডঃ ভট্টাচার্য নাট্যবিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। একাডেমির নাট্যবিভাগের ডীন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সংস্পর্শে এসে তিনি নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে নোতুন নোতুন জ্ঞানলাভের প্রেরণা পান এবং সেই প্রেরণাতেই তিনি নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে দু'খানি বহুতথ্যপূর্ণ গ্রন্থ 'নাট্যতত্ত্বমীমাংসা' ও 'নাটকলেখার মূল সূত্র' রচনা করেন। 'নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ' নামে তিনি আর একখানি নাট্যরীতি বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেন। তবে ওই গ্রন্থে নাট্যরীতি অপেক্ষা সমাজদর্শনের আলোচনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। জীবনের শেষ দিকে তাঁর নাটকের আলোচনায় বস্তুবাদী দর্শনের আলোচনাই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ডঃ ভট্টাচার্য বাংলা বিভাগের রীডার ও অধ্যক্ষ এবং কলাবিভাগের ডীনের পদে নিযুক্ত হন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী নাট্য বিভাগের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে তিনি ওই পদেও অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি বাংলা বিভাগের রীডারের পদ থেকে বিদায় নিয়ে নাট্যবিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীর সর্বোচ্চ পদ—প্রফেসার পদে নিযুক্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি নাট্যবিভাগের প্রফেসার ও অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের

অন্যতম কর্ণধাররূপে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণবিধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ সম্প্রসারণে বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেগুলির বাস্তব রূপায়ণে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

জীবনের শেষ পর্বে তিনি শিল্পতত্ত্বের আলোচনা ও অধ্যাপনাতেই প্রধানত নিবিষ্ট ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করবার কিছু আগে তিনি 'শিল্পতত্ত্বের কথা' নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। পরে ওই গ্রন্থটি পরিবর্ধিত আকারে 'শিল্পতত্ত্ব পরিচয়' নামে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ক্রোচের শিল্পতত্ত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন তিনি দু'খানি গ্রন্থে, যথা 'ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অব এস্থেটিক' এবং 'শিল্পতত্ত্ব—ক্রোচে'। ডঃ ভট্টাচার্যের চেষ্টায় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় শিল্পতত্ত্ব অবশ্য পাঠ্য রূপে গৃহীত হয়েছিল। তিনি নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যের শিল্পতত্ত্ব আলোচনাতেও নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। হ্যান্‌স্‌লিকের 'The Beautiful in Music' নামক গ্রন্থটি তিনি 'সঙ্গীতে সুন্দর' নাম দিয়ে অনুবাদ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতি দেন তাঁকে 'সুধীর দাশগুপ্ত বক্তৃতা মালা' দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে। ওই বক্তৃতামালাই আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে তিনি ডঃ অজিতকুমার ঘোষের সঙ্গে একযোগে 'বিশ্বনাট্য পরিক্রমা' নামে একটি মহাগ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই শেষ গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা আর পূর্ণ হ'ল না। ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

ডঃ ভট্টাচার্য নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের অন্যতম পরিচালক-সদস্য ছিলেন। বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র তিনি বিভিন্ন নাট্য-প্রতিযোগিতার বিচারক রূপে গেছেন এবং নাটক ও নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে মননদীপ্ত আলোচনা দ্বারা শ্রোতাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি শাণিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি নিজে ছোটবেলা থেকেই

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ ক'রে এসেছেন। নিজের গ্রামে, পাটনায় এবং পরবর্তীকালে বঙ্গবাসী কলেজে ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে তিনি বহু নাটকে অভিনয় করেছেন এবং বহু নাটক পরিচালনা করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটারের কর্ণধার ছিলেন তিনি। তাঁর প্রযোজনায় ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ কয়েকটি নাটক অভিনয় করে সমঝদার দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন অর্জন করেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নির্ভীক মতবাদী, সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বলিষ্ঠ সমর্থক এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী সৈনিক। তাঁর মধ্যে তীক্ষ্ণ মননশীলতার সঙ্গে গভীর হৃদয়বত্তার সংযোগ ঘটেছিল। তাঁর আপাতকাঠিন্যের গভীরে স্নেহের ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল। মৌখিক সৌজন্যের পরিবর্তে অকপট আন্তরিকতায় তাঁর অধিকতর বিশ্বাস ছিল। তাঁর অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেন তাঁর বন্ধুমণ্ডলী ও অনুরাগী ছাত্রসমাজ। কিন্তু তাঁর গ্রন্থসমূহ চিরঐশ্বর্যবান করে রাখবে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে।

১। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (১ম খণ্ড)
২। ঐ ঐ ঐ (২য় খণ্ড)
৩। রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা
৪। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা
৫। সাহিত্যতত্ত্ব মীমাংসার ভূমিকা
৬। ক্রোচের এস্থেটিক পরিচয় ও সমালোচনা
৭। মহাকাব্য জিজ্ঞাসা
৮। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ
৯। ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অব এস্থেটিক
১০। বাংলা নাটক ও নাট্যকার (তিন খণ্ড)
১১। হোরেসের আর্স পোয়েটিকা
১২। এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ ও সাহিত্যতত্ত্ব
১৩। শিল্পতত্ত্ব পরিচয়

শ্রদ্ধেয় সুধী শ্রোতৃমণ্ডলী।

বাংলাসাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও কাব্যতত্ত্বরসিক ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে যাঁরা এই বক্তৃতামালার প্রবর্তন করেছেন তাঁদের আমি সমগ্র অন্তর দিয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং স্বর্গত ডঃ দাশগুপ্তের গভীর পাণ্ডিত্যের ও বিদ্যারসিকতার প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমার মতো একজন সামান্য ব্যক্তিকে বক্তা নির্বাচন ক'রে যে আশাতীত সম্মান দেখিয়েছেন এবং নিজের বিদ্যামাতৃকার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আপনাদের মতো সুধীজন সভায় দু'চার কথা বলার দুর্লভ সুযোগ দিয়েছেন, তারজন্য তাঁদের আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা আমার এই সামান্য কথা শোনবার জন্য কষ্ট করে এখানে এসেছেন; আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানেন যে ডঃ দাশগুপ্ত স্কটিশচার্চ কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং শেষ দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে অংশকালীন অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এটুকু নিতান্তই বাহ্য পরিচয়। তাঁর বড় পরিচয় এই যে তিনি ছিলেন একাগ্রমনা বিদ্যোপাসক, একনিষ্ঠ কাব্যতত্ত্বজিজ্ঞাসু। ডঃ দাশগুপ্ত কাব্যতত্ত্বের রহস্যলোক আলোকিত করার ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে অধ্যাপক জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। 'কাব্যালোক' সেই আগ্রহেরই এক অসামান্য ফল।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডঃ দাশগুপ্ত রসবাদের অব্যাপ্তি পর্যালোচনা ক'রে, রম্যার্থবাদের ভিত্তির উপরে যে কাব্যতত্ত্ব নির্মাণ করতে চেষ্টা করে গেছেন, তার পূর্ণতা অপূর্ণতা নিয়ে ভবিষ্যতের সমালোচকরা আলোচনা করবেন। আমি তাঁর দোষ-গুণ নিয়ে কোন আলোচনা করব না। আমার কথা এখানে এইটুকুই

এবং আশা করি আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন,—যে ডঃ দাশগুপ্তের মনে কাব্যতত্ত্বজিজ্ঞাসা অনেকখানি স্থান জুড়েছিল ব'লে, তাকেই অধ্যাপক দাশগুপ্তের 'আসল সত্ত' বা অন্তরাত্মা বলে গ্রহণ করা চলে। তা'ই আমি তাঁর স্মৃতি বক্তৃতায় এমন একটি বিষয়কেই বক্তৃতার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছি, যা' তাঁর আন্তরিক ইচ্ছারই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত, যা' যুগপৎ শিল্পের তত্ত্বেরও শিল্পসমালোচনার মূল সমস্যার উপরে আলোকপাত করবে। প্রথমে এ কথাটি আমার মনে জেগেছিল যে ডঃ দাশগুপ্ত প্রাচীন ভারতের কাব্যতত্ত্বচিন্তা নিয়ে আলোচন' ক'রে গেছেন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন মতবাদের আলোকে কাব্যতত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা ক'বে ডঃ দাশগুপ্তের স্মৃতি-তর্পণ করলে ভাল হয়। কিন্তু সে ইচ্ছাকে আমি দমন করেছি এবং করেছি এই কারণেই যে এই বিষয়টি নিয়ে অনেকেই কমবেশী আলোচনা ক'রে গেছেন, আমার আলোচনাকে নতুন খাতে নিয়ে যেতে হ'লে, আলোচনাকে সমালোচনায় পরিণত করতেই হবে।

আমি এক্ষেত্রে তা' পরিহার করতে চাই এবং চাই বলেই আমার বক্তৃতার বিষয় করেছি—"শিল্পতত্ত্বের কয়েকটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী ও সাহিত্য সমালোচনা।" এই বিষয়টি নির্বাচন করার উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ শিল্প সমালোচনার মূল সমস্যার দিকে শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ঐ সমস্যার মূলে শিল্পতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ মতবাদ কিভাবে কাজ করছে, সেইটি নির্দেশ করা এবং গৌণতঃ সাহিত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যে যে বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হয়ে থাকে, তাদের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা। বলা বাহুল্য বিষয়টি প্রাংশুলভ্য ফল। বামন হ'য়ে প্রাংশুলভ্য ফলে লোভ করলে উপহাস্য হওয়ার আশঙ্কা থাকে, আমার মনেও সে আশঙ্কা আছে। তবে ভরসাও আছে; ভরসা এই যে আপনাদের মতো সুধী সজ্জন শ্রোতা, যাঁরা নিজগুণে অনেক কিছু ক্ষমা ক'রে নেবেন।

আপনারা নিশ্চয়ই এতখানি প্রত্যাশা কেউ করবেন না যে, প্রাচীন কাল থেকে

আজ পর্যন্ত শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণের যে ধারাবাহিক চেষ্টা হয়েছে, আমি তার ইতিহাস এবং প্রত্যেকটি সংজ্ঞার দোষগুণের আলোচনা উপস্থাপিত করব। বক্তৃতার এই সংকীর্ণ পরিসরে তা করা যে সম্ভব নয়, তার জন্য বড় একখানি গ্রন্থের পরিসর আবশ্যক, এ বিষয়ে সকলেই আপনারা একমত হবেন। তবে একে আপনারা 'শকেই হাত জোড়' ব'লে মনে করবেন না। আমি কিছুই না দেওয়ার জন্য দাতার আসনে বসিনি। সবগুলি সংজ্ঞার উল্লেখ ও সমালোচনা আমি করব না এ কথা ঠিক, কিন্তু সে অভাব অন্য উপায়ে পূরণ করতে চেষ্টা করব। এ কথা সত্য এবং স্মরণীয় যে সংজ্ঞাগুলির সব কয়টিই স্বতন্ত্র সংজ্ঞা বা মৌলিক সংজ্ঞা নয়; ভাষা ও পরিভাষা দেখে না ভুললে দেখা যাবে আসল সংজ্ঞার সংখ্যা খুবই কম এবং সমস্ত সংজ্ঞাকে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর শিরোনামায় সাজিয়ে রাখা যেতে পারে। ঐ বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় স্পষ্ট করে তুলতে পারলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে; শিল্পসমালোচনার সমস্যাটি স্পষ্টাকারে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়াবে।

এখানেই যে প্রশ্নটি অনেকের মনে উঁকি দিতে পারে সেটি এই যে, শিল্প-সমালোচনার সমস্যা-সম্বন্ধীয় আলোচনায় শিল্পতত্ত্বের মতবাদগুলির আলোচনা অপরিহার্য কি? এই প্রশ্নটির মীমাংসা সকলের আগেই হওয়া উচিত এবং গোড়া'তে আমি এই বিষয়টি নিয়েই কয়েকটি কথা বলতে চাই। পণ্ডিতরা একথা একবাক্যেই স্বীকার করেছেন যে শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে যে অরাজকতা দেখা যায় যে অরাজকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত কবি-সমালোচক টি. এস. এলিয়ট মহাশয় সমালোচনাক্ষেত্রটিকে—"no better than a Sunday park of contending and contentious orators who have not even arrived at the articulation of their differences" বলেছিলেন, সেই অরাজকতার মূলে রয়েছে শিল্পতত্ত্ব-বিষয়ে পরিপাটি জ্ঞানের অভাব। এই অভাবের ফলেই, সমালোচকরা শিল্পতত্ত্বের নির্দিষ্ট মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূল্যায়নে অগ্রসর হ'তে পারেন না, মূল সিদ্ধান্তের যে সব অনুসিদ্ধান্ত হওয়া

উচিত সেগুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকেন না ব'লে পরস্পর বিরুদ্ধ রীতি প্রয়োগ করেন।

এ কথা প্রত্যেক সমালোচকই মেনে থাকেন যে সমালোচনা হচ্ছে শিল্পের মূল্য বিচার, উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার, কিন্তু শিল্পের আসল মূল্যের স্বরূপ কি, শিল্পের মধ্যে মানুষ তার কোন মূল্য চেতনাকে প্রকাশ করতে চায়, কোন মূল্যের উপলব্ধি হওয়ায় শিল্পসম্ভোগ করে মানুষ আনন্দিত হয়, এ সম্বন্ধে শিল্প সমালোচকদের মধ্যে নানা মুনির নানা মত। সমালোচনার রীতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে যে মতান্তর রয়েছে তার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ববিদ হ্যারোলড্ ওসবোর্ণ মহাশয় তাঁর বহুপঠিত "এস্থেটিক এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজিম" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"Until you agree what a man is supposed to be doing you can not agree whether he has done it well. It will be our concern to show that every formulation of doctrine, every casul remark about the critic's function, indeed every assay of practical criticism inevitably and inescapably implies theoretical assumptions which belong to the province of Aesthetics and therefore so long as aesthetics remain inchoate criticism must needs be muddled and confused—(৬ পৃষ্ঠা)॥ বাংলায় তর্জমা ক'রে বললে এই দাঁড়াবে—"মানুষ কি করতে চায় তা' না জানা পর্যন্ত, সে ভাল করেছে কি না তা' বলা যায় না। আমাদের উদ্দেশ্য হবে এই দেখানো যে প্রত্যেকটি বিধি-বিধান; সমালোচকের কর্তব্য সম্বন্ধে যে কোন মন্তব্য, সমালোচনা কার্যের মূল্যায়ন অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী-ভাবে তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত-সাপেক্ষ এবং ঐ সিদ্ধান্তগুলি শিল্পদর্শনেরই এক্তিয়ারভুক্ত। এই কারণে, শিল্পদর্শন অপরিচ্ছন্ন হ'লে সমালোচনা ঘোলাটে ও এলোমেলো হবেই।" বাস্তবিকই বিচার মাত্রেই বিধিসাপেক্ষ, সাধারণ সিদ্ধান্তের বা ধারণার আলোকে রেখে বিশেষের মূল্যাবধারণ। মূলে গণ্ডগোল থাকলে বিচার-বিশৃঙ্খলা যে অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে এটুকু বুঝতে কা'রোও কোন কষ্ট হবে না। এ কথা

যে শুধু হ্যারোলড্ ওসবোর্ণ মহাশয়ই বলেছেন তা' নয়, এ কথা প্রত্যেক বড় সমালোচকেরই কথা এবং অতি সত্য কথা॥ 'There can be no single judgment of practical criticism which does not involve latent doctrines of aesthetics. And if your aesthetic is bad, whether it be overt or implied, your criticism can not well evitate ultimate futility (২৬ পৃষ্ঠা—এ: এ্যা: ক্রি:)। ওসবোর্ণের এই উক্তির সঙ্গে সকলেই একমত। কারণ শিল্পতত্ত্বই সেই শাস্ত্র যা শিল্পের আসল মূল্য, শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণ করে থাকে এবং ঐ মূল্যটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্যান্য মূল্যের সঙ্গে শিল্পসাধিত মূল্যের সম্পর্ক বিচার করে থাকে; সত্যমূল্য, শিবমূল্যের সঙ্গে সৌন্দর্যমূল্যের সম্পর্ক আছে কি নেই তা নিয়ে আলোচনা করে থাকে। এ সব প্রশ্ন ছাড়াও, আরো অনেক প্রশ্ন নিয়ে শিল্পতত্ত্ব আলোচনা করে থাকে। সৌন্দর্যকে শিল্পের সামান্য লক্ষণ ব'লে স্বীকার করে নেওয়ার পরেও যেসব সমস্যা থেকে যায়, যেমন প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য একই রূপে ব্যক্ত হয় কি না, চারুকলাগুলি—ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে 'parallel' তাই কি না, জ্যাঁ পল সার্তের ভাষায় বলতে গেলে—to talk paniting in the jargon of the musician or the literary man and to talk literature in the jargon of the painter as if at bottom there were only one art which expressed itself indifferently in one or other of these languages". অর্থাৎ সাহিত্যের বা সংগীতের পরিভাষায় চিত্র সম্বন্ধে এবং চিত্রের পরিভাষায় সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলা, যেন মূলে একটিমাত্র 'শিল্পই' রয়েছে যা বিশেষ বিশেষ মাধ্যমে সুযোগমত আত্মপ্রকাশ করে থাকে—এ কথা বলা ঠিক কি না এই সব প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসার জন্য আমাদের শিল্পতত্ত্বেরই শরণাপন্ন হতে হয়। শিল্পতত্ত্বই আমাদের শিখিয়ে দেয় শিল্পের কোন সংজ্ঞাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কোন্ সংজ্ঞা গ্রহণ করলে, কোন্ মূল্যকে শিল্পের আত্মা বলে স্বীকার করতে হবে এবং সমালোচনাকালে কোন্ কোন্ বিষয়ের বিচারের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। বলা বাহুল্য;

শিল্পসমালোচনাকে অশিক্ষিতপটুদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার বিবৃতির স্তর থেকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে হ'লে শিল্পতত্ত্বের গভীর ও ব্যাপক অনুশীলন আবশ্যক এবং খুবই ক্ষোভের কথা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্পতত্ত্বের পঠন-পাঠন অবহেলিত হয়ে আছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা যাঁরা মানুষ হয়েছি, তাঁদের শিল্পতত্ত্বের জ্ঞান খুবই সীমিত ও খাপছাড়া। আমি মনে করি, প্রত্যেক চারুকলার অধ্যাপকই আমার মতোই শিল্পতত্ত্বজ্ঞানের দৈন্য অনুভব ক'রে পীড়া বোধ করে থাকেন এবং এ কথা মর্মে মর্মে স্বীকার করবেন যে সঙ্গতিপূর্ণ সমালোচনা করতে পারেন একমাত্র তিনিই, শিল্পতত্ত্বশাস্ত্র পড়ার পরে যাঁর মধ্যে শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা, একটি সুনির্দ্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে। বিষয়-নির্বাচনে আমার দুঃসাহস প্রকাশ পেয়েছে,—এ কথা আমি মানছি কিন্তু 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না' এ আক্ষেপও সার্বজনীন। আপনারা আমার স্পর্ধা ক্ষমা করবেন।

শিল্পতত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদকে কয়েকটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী বা ধারণার ভিত্তিতে শ্রেণীভুক্ত করতে গিয়ে কোন কোন শিল্পতত্ত্ববিদ মোটামুটি পাঁচটি শ্রেণী কল্পনা করেছেন। প্রথম শ্রেণীকে বলেছেন—বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Realist assumption) দ্বিতীয়টিকে বলেছেন—আবেগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Emotional assumption), তৃতীয়টিকে বলেছেন—প্রকাশবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Expressionist assumption), চতুর্থটিকে বলেছেন—অতীন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ (Transcendentalism) এবং পঞ্চমটিকে বলেছেন—'জৈবিক ঐক্য' বা সমন্বিত ক্ষেত্র নির্মাণবাদ (Configurational assumption)। আমি প্রথম বক্তৃতায় বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আলোচনা করব, দ্বিতীয় বক্তৃতায় আবেগবাদী ও আনন্দবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে, তৃতীয় বক্তৃতায়—প্রতিভানবাদী ও অপূর্ববস্তু বা অবস্তু নির্মিতিবাদ নিয়ে আলোচনা করব এবং শেষ বা চতুর্থ বক্তৃতায়—সাহিত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যসমালোচনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি এই কটি মতবাদের আলোচনায়

ভিতর দিয়ে শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের যে চেষ্টা হয়েছে তার একটা ছবি এবং শিল্পসমালোচনার সমস্যার রূপটি আপনাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। তবে গোড়াতেই, আই. এ. রিচার্ডসের অনুকরণে ব'লে রাখছি—এত বহু-দিনের বহু-আলোচিত এবং বহু জটপাকানো সমস্যার সমাধান এক কথায় ক'রে ফেলবো, এ কথা কেউ যদি মনে ক'রে থাকেন, তাহ'লে তাকে হতাশ হ'তে হবে। আমার এই আলোচনা—যতটা সমস্যার উপস্থাপনা, ততটা সমাধান নয়। কথায় বলে, সমস্যা-চেতনা সমাধানের অনেকখানি। আমি সেইটুকু করতে পারলেই—এ নিয়ে ভাবনার কথা যা' আছে সেই ভাবনাটুকুও জাগাতে পারলেই,—আপনারা যাই মনে করুন—আমি নিজেকে ধন্য মনে করব॥

আমার প্রথম বক্তৃতার বিষয়—শিল্পতত্ত্বে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনার মধ্যে আমি শিল্পতত্ত্বের প্রাচীনতম মতবাদ অনুকরণবাদ এবং তারই আধুনিক সংস্করণ—সংকেতবাদ (art as Semantic) এবং সত্যপ্রকাশবাদ (art as truth) এই তিনটি মতবাদের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি। অনুকরণবাদের নাম শুনে অনেকেরই মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং প্রশ্ন জাগতে পারে—যে অনুকরণবাদের নাম শুনলে আধুনিকরা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, অশ্রদ্ধেয় ব'লে যে মতবাদটি বহুকাল উপেক্ষা সহ্য করে আসছে সেই মতবাদ নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ কি? উত্তরে শুধু এই কথাটিই বলার আছে, সত্য বটে অনুকরণবাদ বহুনিন্দিত এবং বহুনিন্দিত ব'লে অশ্রদ্ধেয়, কিন্তু এ কথাটি আরো সত্য যে শিল্পসমালোচনায় এই মতবাদটির প্রভাব এখনও বেশ প্রবল। অধ্যাপক গিলবার্ট মারে মহাশয় তার "প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী" নামক গ্রন্থের (১৯২১) "পোয়েটিকস্ এ্যাণ্ড মাইমেসিস্" প্রবন্ধে অনুকরণবাদের পক্ষে জোরালো ওকালতি করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"**the conception of Art as mimesis though rejected by almost all recent critics, has a justification and may even show real profoundity of insight. Mimesis is, I suspect, not only an essential element in all art, but also**

our greatest weapon, for explaining and for understanding the world"। অধ্যাপক মারের মন্তব্যকে অনেকেই অতিশয়োক্তি ব'লে পাশে সরিয়ে রেখেছেন, অনুকরণ সব শিল্পেরই "essential element" এ কথা সকলে মানেননি—এ সবই সত্য, সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে একা মারেই নন, মারের পরে আরো অনেকে অনুকরণবাদের প্রভাব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হ্যারোলড ওসবোর্ন মহাশয়ের 'এস্থেটিক এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজিম' গ্রন্থেও আমরা এই ধরনের মন্তব্য দেখতে পাই—Naive Rea ism, as we have said. is no longer respectable yet the old imitation-idea will not so easily be uprooted but remains much of its former plausibilities and in more devious ways still influences the writings and judgments of many who repudiate it with horror. And it is natural that it should.... For when ever you contemplate a work of representational art you know at the back of your mind that it is not real, that it is a pretence, a make-believe, not the real thing but a copy, an imitation (৬৫ পৃষ্ঠা)॥ এর সারার্থ এই যে স্থূল বাস্তববাদ আজ কেউই মানেন না বটে, কিন্তু প্রাচীন অনুকরণ-ধারণাটি সহজে উন্মূলিত হ'বার নয়। এবং তার আগেকার ঔচিত্য সে অক্ষুণ্ণই রেখেছে। এমন কি যারা অনুকরণ শব্দটি শুনে আঁতকে ওঠেন এবং মতাদর্শ খণ্ডন করে থাকেন, তাদের লেখা ও সমালোচনাও অনুকরণবাদের দ্বারা প্রভাবিত। আর এ খুবই স্বাভাবিক, কারণ যখনই তুমি উপস্থাপনাত্মক শিল্পের কথা চিন্তা করতে যাও, তখনই মনে মনে জান যে ঐ বস্তুটি বাস্তব কোন কিছু নয়, একটা ভাণ, বাস্তব বলে-ধরে নেওয়া একটা বস্তু, প্রাকৃতিক বস্তু নয়, বস্তুর একটা নকল—একটা অনুকরণ॥ বাস্তবিক, এ কথা তো অস্বীকার করা চলে না দৃষ্টিগ্রাহ্য ও সাহিত্যশিল্পের অধিকাংশই জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই বর্ণনা বা উপস্থাপিত করে এবং সেই হিসাবে সেগুলি বস্তুসাপেক্ষ। শিল্পের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্পর্ক এবং শিল্প-

সমালোচনায় তার প্রভাব কোনভাবেই উপেক্ষণীয় নয় এবং নয় ব'লেই এ কথা অনেকেরই—কথা "the realistic theory of art seems to correspond to something inherently true in mankind's instinctive attitude to artistic products (৬২ পৃ: এ: এ্যা: ক্রি:)। অর্থাৎ শিল্প বাস্তব সত্তার উপস্থাপনা এই মতবাদটির সঙ্গে মানুষের শিল্পের প্রতি সহজ মনোভাবের নিগূঢ় যোগ রয়েছে। এই কারণেই আমি অনুকরণবাদের তাৎপর্য বিচার দিয়ে আলোচনার আরম্ভ করছি।

মূর্তিশিল্প, চিত্রশিল্প, সংগীত, কাব্য, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে, সহজ বুদ্ধিতেই মানুষ শিল্পকে অনুকৃতিকরণ বলে মনে করেছে এবং সে মানুষ শুধু গ্রীসের বা ভারতের মানুষ নয়, সব দেশেরই মানুষ। যুরোপীয় সভ্যতার স্মৃতিকাগার গ্রীসের এবং এসীয় সভ্যতার মূর্তিকাগার ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শিল্প চিন্তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে গেলে দেখা যাবে, উভয় দেশেই শিল্পকে অনুকরণ জাতীয় বস্তু বলে গণ্য করা হয়েছে। প্রচীন গ্রীসের প্লেটো ও তার শিষ্য এরিস্টটল এবং প্রাচীনভারতের মুনিরা বিশেষতঃ 'মুনীনাং ভরতো মুনিঃ' শিল্পকে অনুকরণ বলে মনে করতেন—এ কথা আজ প্রায় সকলেই জানেন। প্রাচীন ঋষিরা শিল্পকে 'আত্মসংস্কৃতি' বা আত্মার সৃষ্টি বলে জানতেন অর্থাৎ আত্মিক ক্রিয়ারই অন্যতম রূপ বলে গণ্য করতেন—এ কথাটি যেমন প্রমাণ করা কঠিন নয়, তেমনি ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে, নাট্যকে 'লোকবৃত্তানুকরণ' ব'লে অভিহিত করেছেন এ কথা বহুবিদিত। বলাবাহুল্য, আত্মসংস্কৃতি ব'ললে আত্মিক ক্রিয়ার যতখানি স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়, শিল্পকে আত্মার অন্তর্নিহিত আকুতির অভিব্যক্তি ব'লে self expression বলে মনে করা হয় অনুকরণ বললে ততখানি স্বাধীন ক্রিয়া ব'লে গণ্য করা হয় না। 'অনুকৃতি' শব্দটি শুনলেই এ কথা মনে হয় অনুকর্তার সামনে রয়েছে বাস্তব একটি জগৎ এবং অনুকর্তা তার প্রকাশ শক্তি বলে সেই বাস্তব জগতের বিচিত্র রূপকে ব্যক্ত করছেন এবং তা করছেন বিষয়ের অনুগত থেকেই। যাঁরা অনুকরণবাদকে

স্বীকার করেননি—কি ওদেশে কি এদেশে,—তাঁরা শিল্পকে স্বাধীন আত্মিক ক্রিয়ার ফল বলে প্রতিপন্ন করতে আত্মাকে বিষয়নিরপেক্ষ সৃষ্টির ক্ষমতা দিতে চেয়েছেন। আমরা দেখতে পাই, আমাদের দেশেই, ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার অভিনবগুপ্ত নাট্য যে অনুকরণ হ'তে পারে না এই সিদ্ধান্তের পক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করেছেন, তিনি বলতে চেয়েছেন অনুকরণ বলতে বুঝায় 'সদৃশকরণ', কিন্তু অনুকরণ করা যায় শুধু তজ্জাতীয়েরই, তৎসদৃশের নয়। উৎসুক পাঠক অভিনবভারতীর এই অংশ এবং প্লেটো-এরিষ্টটল পড়ে দেখবেন এবং পড়লেই বুঝবেন, কি গ্রীসে বা কি ভারতে অনুকরণ শব্দটি যাকে বলে 'যান্ত্রিক অনুকরণ' সে অর্থে প্রযুক্ত হয়নি, 'অনুকরণ' শব্দটি মানব মনের বিষযানুগ সৃষ্টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিল।

আপনারা জানেন, 'অনুকরণবাদ' বলতেই আমাদের প্লেটো-এরিস্টটলের মতবাদের কথা মনে আসে। সুতরাং অনুকরণবাদের পরিচয় দিতে প্লেটো-এরিস্টটলের মত উপস্থাপিত করলেই যথেষ্ট হবে। প্রথমতঃ প্লেটোর শিল্প চিন্তার কথাই বলা যাক। প্লেটোর শিল্পচিন্তার প্রধান অংশ পাওয়া যায় তাঁর বহুবিদিত গ্রন্থ—রিপাবলিকের দশম অধ্যায়ে। সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন—জগতে আমরা যত বিশেষ বিশেষ বস্তু দেখি, সেই প্রত্যেক বিশেষেরই মূলে আছে—এক সামান্য যার মধ্যে থেকে, বহু বিশেষকে একজাতীয় ঐক্য দান করে। এই সব সামান্য বা বিশেষের পরাদর্শটি বিশেষ থেকে পৃথক হ'য়ে প্রকৃতির মধ্যে অথবা ভগবানের মনের মধ্যে বিরাজ করছে। বিশেষ মাত্রই সামান্যের নকল বা প্রতিকৃতি। প্লেটোর মতে পরাদর্শের নির্মাতা হচ্ছেন স্বভাব-কর্তা ঈশ্বর এবং ঐ পরাদর্শের প্রতিকৃতি হ'চ্ছে প্রাকৃতিক বস্তু এবং প্রাকৃতকল্প মানুষের সৃষ্টিগুলি। কিন্তু এই দুই জাতীয় বস্তু ছাড়াও আর এক প্রকার বস্তু আছে—যা বিশেষেরই মায়িক রূপ বা মায়াবিগ্রহ, প্লেটোর ভাষায় 'appearasive' বা 'image'। যারা এই তৃতীয় শ্রেণীর বস্তু নির্মাণ করেন তারাই হচ্ছেন শিল্পী এবং ঐ বস্তু-

গুলির পরিভাষা শিল্প। প্লেটো দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন :—ধরা যাক একখানি খাট। ছুতোর মিস্ত্রী যে খাটখানি তৈরী করেছেন, সে একখানি বিশেষ খাট এবং স্বভাবকর্তা ঈশ্বরকৃত খাটের সামান্য রূপের বা পরাদর্শের অনুকরণেই। প্লেটোর বক্তব্য 'যেন' এই যে খাটের ধারণা (Idea) না থাকলে বিশেষ খাট তৈরী হতে পারে না। সে যাই হোক, 'ছুতার মিস্ত্রী' যে খাটখানি তৈরী করেছেন, সে তো প্রাকৃতিক বস্তুরই মতো একটা বস্তু, সে কোন বস্তুর মায়িক রূপ নয়। কিন্তু যে চিত্রকর খাটের ছবি আঁকেন, তিনি তো, খাটের মায়িক রূপ তৈরী করেন, এবং মায়িকরূপ ব'লেই সেই খাট ব্যবহারের অযোগ্য। এই যে এক খাটেরই তিনজন কর্তাকে আমরা দেখলাম—একজন স্বভাবকর্তা ঈশ্বর—যিনি খাটের পরাদর্শ সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়জন ছুতোর মিস্ত্রী—যিনি খাটের বাস্তব বা কাষ্ঠময় রূপ নির্মাণ করেছেন এবং যাকে প্লেটো বলেছেন—'ম্যানুফ্যাকচারার' এবং তৃতীয়জন খাটের অনুকর্তা; প্লেটোর ভাষায়—imitator of what the other two manufacture, "maker of the image". এই তৃতীয় কর্তার কর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্লেটো যে কটি কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য, কারণ তাতে চারুশিল্পের স্বরূপ অনেকখানি উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে। প্রথমতঃ শিল্পীরা হচ্ছেন—"maker of images"—রূপকল্পের স্রষ্টা। বস্তু ও রূপকল্পের বা অনুকৃতির পার্থক্য প্লেটোর দেওয়া দৃষ্টান্ত থেকেই উদ্ধার করা যেতে পারে। ছুতোর মিস্ত্রীর তৈরী খাট এবং চিত্রকরের আঁকা খাট, এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য অতিস্পষ্ট এবং তা' দু'বিষয়ে। এক উপাদানগত পার্থক্য, দুই উপাদানগত পার্থক্যের জন্যই ব্যবহারগত পার্থক্য। ছুতোর মিস্ত্রীর খাটের উপাদান—কাট, চিত্রকরের খাটের উপাদান—রেখা ও রং। প্রথম খাট ব্যবহার্য অর্থাৎ শয়নোপযোগী, দ্বিতীয় খাট শয়নোপযোগী নয়, শুধু দর্শনীয়, সুতরাং উপভোগ্য। এ যেন 'অবস্তু বস্তুকিঞ্চিৎ'। বস্তুকল্প হ'য়েও বস্তু নয়। এই দিক লক্ষ্য করেই প্লেটো শিল্পকে—image of appearance বলেছেন। এই প্রথম প্রকৃতি থেকেই শিল্পের অন্যান্য প্রকৃতি এসেছে। শিল্প যেহেতু তৃতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশ করতে পারে না অথবা

প্রয়োজন বা উপযোগ মেটাতে পারে না, শিল্প একমাত্র আমোদজনন (enjoyment) একমাত্র 'pleasurable experience' আনন্দজনক রূপ-সাক্ষাৎকার ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সিদ্ধান্ত শুনে অনেকেরই মনে ধাক্কা লাগবে। যে প্লেটো শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসে নীতিবায়ুগ্রস্ত, ঐন্দ্রিয়-আনন্দ-বিরোধী ও শিল্পবিরোধী রূপে চিত্রিত, তাঁর সঙ্গে এই প্লেটোর মিল কোথায়—এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগতে পারে এ প্রশ্নও প্রত্যাশিত—শিল্পের আবেদন 'pleasurable experience' এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ এ কথা কোথায় প্লেটো বলেছেন?"

এ কথা ঠিক যে বিশেষ অবস্থার চাপে প্লেটো সত্যের ও নীতির মুখ চেয়ে শিল্পকে বর্জন করতে, আদর্শ রাষ্ট্র থেকে শিল্পীদের বহিষ্কৃত করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয়, শিল্পদার্শনিক প্লেটো শিল্পের স্বরূপ আলোচনার সময় নিজেকে অনেকখানি নিরাসক্ত রেখেছিলেন। প্লেটোর সব মন্তব্য মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে, যে সিদ্ধান্ত করা হ'য়েছে, সেই সিদ্ধান্তে পৌছানোর অনুকূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে। রিপাবলিক গ্রন্থের দশম অধ্যায় থেকে দৃষ্টিকে একটু সরিয়ে নিয়ে, গোড়ার দিকে নিক্ষেপ করলেই দেখা যাবে, প্লেটো সমস্ত বস্তুকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীতে আছে সেই সব বস্তু যেগুলি আমরা শুধু আমাদের প্রয়োজন মেটাতেই চাই; দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে সেইগুলি যেগুলি আমাদের একই সঙ্গে প্রয়োজন মেটায় ও আনন্দ দেয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে আছে সেই সব বস্তু যাদের শুধু "pleasurable experience" এর জন্যই চাওয়া হয়। যেমন, "things of enjoyment"। এখন প্রশ্ন হবে 'things of enjoyment'-না হয় সেই বস্তু হ'ল যা' আমাদের pleasurable experience দেয়, কিন্তু এমন কথা কি কোথাও আছে যে 'imitation' 'things of enjoyment' এর অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ এই কথা লেখা অছে—ইমিটেশান things of enjoyment-এরই অন্যতম। এইবার প্লেটোর স্বীকৃতিগুলি সাজিয়ে দিলে কি দাঁড়ায় দেখা যেতে পারে—

প্লেটোর মতে শিল্প হ'ল অনুকরণ, অনুকরণ আমোদজনক সামগ্রী এবং আমোদজনক সামগ্রী হচ্ছে 'সেই বস্তু যা' আমাদের একমাত্র রূপসাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দই দেয়, অতএব শিল্প হ'ল সেই বস্তু যার pleasurable experience দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। প্লেটোর শিল্পচিন্তাকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন আছে। এই কথাটা আমার বার বার মনে হয়েছে এবং কোন দিক থেকে নতুন মূল্যায়ন করতে হবে তার সামান্য ইঙ্গিত এখানে দিলাম এবং প্লেটোর উক্তিগুলিকে মিলিয়ে দেখলে ঐরূপ সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব কি না তা বিচার করবার ভার আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম।

তৃতীয়তঃ শিল্প যেহেতু অনুকরণবৃত্তিজাত এবং অনুকরণ বুদ্ধির এলেকার বহির্ভূত, বুদ্ধি অপেক্ষা নিম্নতর স্তরের ব্যাপার, এবং নিম্নতর স্তর অনাত্মিক আবেগসত্তার স্তর, অনুকরণ আবেগমূলক ও অবুদ্ধিকৃত ব্যাপার। এ এমন একটি কৃতি, যা—প্লেটোর ভাষায়—"Associates with that element in us which is removed from insight and is its companion a d friend to no healthy or true purpose।" 'আয়ন' নামক সংলাপটি পাঠ করলে এই ধারণাই হবে যে প্লেটোর মতে শিল্পসৃষ্টি একটা আবেগ চালিত ব্যাপার, দিব্যোন্মাদনার মতো বুদ্ধিনিয়ন্ত্রণনিরপেক্ষ অর্থাৎ নির্বিকল্পক ব্যাপার। ক্রোচের পরিভাষা ব্যবহার করে বললে বলা যায়, অনুকরণ এমন এক প্রকার জ্ঞান-কর্মাত্মিকা ক্রিয়া যা প্রতিরূপ সৃষ্টি করে অথচ যার সঙ্গে নৈয়ায়িক জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই; এক কথায় তা Feeling-এর ব্যাপার। প্লেটোর শিল্পতত্ত্বচিন্তার সমালোচনা প্রসঙ্গে ক্রোচে যা বলেছেন তা' অনুধাবন করলেই উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হবে না। ক্রোচে বলেছেন—প্লেটো ভুলের গর্তে পড়েছেন এই কারণেই যে তিনি নৈয়ায়িক জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না এবং নৈয়ায়িক জ্ঞানের গণ্ডীর বাইরে আবেগের রাজ্য ছাড়া আর কোন মানসিক ক্রিয়ার দেশ তার চোখে

পড়েনি। ক্রোচের শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস পড়লেই দেখতে পাবেন—ক্রোচে এই সব ভুলের গর্তের দিকে নজর রেখেই শিল্পতত্ত্ব চিন্তার মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন—তাঁর আগে সকলেই বেশী কম এই ভুলের গর্তে পা দিয়েছেন। এমন কি কাণ্টের মতো দার্শনিকও গর্ত এড়িয়ে চলতে পারেননি।

দিব্যপ্রেরণার আবেশে শিল্পীরা যে পরাসত্তার স্বরূপ ধ্যান ও প্রকাশ করতে পারেন এই সংস্কার পরবর্তীকালে নব্য প্লেটোবাদীদের ট্রানসেনডেন্টালিজিমের মধ্যে, আরো অনেক পরে রেনেশাঁস যুগের সৌন্দর্যতত্ত্ব বিচারের মধ্যে এবং তারও অনেক পরে রোমান্টিক আন্দোলনের দর্শনে—তথা আত্মপ্রকাশবাদের মধ্যে, ব্যক্ত হয়েছিল। সে যাই হোক অনুকরণবাদের প্রথম প্রবক্তা প্লেটোর সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে এই যে শিল্প প্রাকৃতিক বা মানবকৃত বস্তুর অনুকরণ, আইডিয়াকে প্রকাশ করার সামর্থ্য শিল্পের নেই, নেই এই কারণেই যে আইডিয়া বিশেষ নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নিয়ে বিশুদ্ধ সত্তায় বিরাজ করে। অবশ্য এ কথাও এই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, প্লেটোর শেষ দিকের রচনায় এমন এক ধরনের শিল্পের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে যা প্রত্যক্ষ জগতের বিশেষ বস্তুর অনুকরণে নয়, যা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষলব্ধ সত্য স্বরূপের অনুকরণ বা অনুধ্যান। তাইমেউস নামক সংলাপে প্লেটো লিখেছেন—"When the artificer fastens his gaze upon the eternally unchanging and using it as his model reproduces its essential form and power then every thing must necessarily turn out beautiful, but when he gazes upon what has tak n upon itsself sensory being usiug that as his model his work has not beauty।" এখানে প্লেটো স্বীকার করছেন—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অনুকরণে সৌন্দর্য থাকে না, অনুকরণ যত আদর্শের অনুধ্যানে পর্যবসিত হয় তত তা পূর্ণ ও নিত্যকে ধারণ করে তত তা সুন্দর হয়। বলা বাহুল্য, তাইমেয়ুসের প্লেটো এবং রিপাবলিকের প্লেটো এক প্লেটো নয় এবং

আমার মনে হয়, রিপাবলিকের প্লেটোর সঙ্গেই এরিষ্টটলের মতভেদ হয়েছিল যদিও মতভেদের মূল ছিল দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্যের মধ্যেই।

পণ্ডিতরা মনে করেন—"আইডিয়া"র স্বরূপ ব্যাখ্যা নিয়ে গুরুশিষ্যের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। সামান্য ও বিশেষের সম্পর্ক নিয়ে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল সেই মতভেদই উভয়ের শিল্পতত্ত্বচিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। এরিষ্টটলও শিল্পকে অনুকৃতিকরণ বলে মনে করতেন তবে বিশেষ নিরপেক্ষভাবে সামান্য কোন পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারে না—এই ধারণা পোষণ করতেন ব'লে শিল্পকে কখনই সামান্যবর্জিত ব'লে মনে করেননি এবং করেননি বলেই শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—শিল্প বিশেষের মাধ্যমে সামান্যকেই অনুকরণ করে। এই সংজ্ঞার তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করা দরকার। ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তক এরিস্টটল নৈয়ায়িক বুদ্ধি প্রয়োগ করে শিল্পের যে সংজ্ঞা তৈরি করেছেন, ক্রোচে তার জন্য তার খুবই প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন এরিস্টটলই প্রথম বৈজ্ঞানিকের মতো শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছিলেন। একদিকে দর্শন-বিজ্ঞান থেকে অন্য দিকে ইতিহাস থেকে তিনি সাহিত্য শিল্পকে পৃথক করেছেন। একদিকে বিশুদ্ধ সামান্য অন্যদিকে ইতিহাসের নিছক 'বিশেষ' তার মাঝে শিল্প যা বিশেষের-মাধ্যমে-সামান্য। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'concrete universal'। এই যদি হয় শিল্পের স্বরূপ, তা' হ'লে শিল্প নিশ্চয়ই সত্য থেকে তিন ধাপ দূরের বস্তু নয়—মিথ্যার জগৎ নয়, নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয়, শিল্প শেষ পর্যন্ত 'আইডিয়া' বা সত্যকেই প্রকাশ করে। শিল্পের আবেদন শুধু 'pleasurable experience'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সত্যের দিকেও শিল্পের দৃষ্টি থাকে। একদিকে শিল্প আমাদের সত্যবোধকে জাগ্রত করে, অন্যদিকে আবেগের উদ্রেক ঘটিয়ে অবদমিত ও দুষ্ট আবেগকে মন থেকে নিষ্কাষিত করে, উত্তেজক আবেগের প্রশমন ঘটিয়ে মনকে শান্ত ও সংযত করে। প্লেটো-এরিস্টটলের ধারণাকে সূত্রাকারে এইভাবে উপস্থাপিত করা যেতে

পারে :—শিল্প যে রূপ বিশেষ—অনুকৃতিকরণ—এ বিষয়ে উভয়েই একমত। কিন্তু গুরুর কাছে ঐ রূপ বিশেষেরই অনুকরণ, শিষ্যের কাছে—সামান্যের অনুকরণ। গুরুর মতে শিল্পীর দৃষ্টি বিশেষের জগতেই সীমাবদ্ধ, শিষ্যের মতে শিল্পীর দৃষ্টি বিশেষের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সামান্যের রাজ্যে প্রসারিত। গুরুর মতে—শিল্প মিথ্যার জগৎ, সত্য থেকে তিন ধাপ দূরের জগৎ—শিষ্যের মতে শিল্প সত্যেরই বাস্তব আকৃতি, গুরুর মতে শিল্প আবেগ জাগিয়ে নিম্নতর সত্যকে, পশুপ্রকৃতিকে পুষ্ট করে, শিষ্যের মতে শিল্প আবেগ জাগায়, তথা আবেগের শোধন ক'রে—মনকে শান্ত ও সংযত ক'রে।

প্লেটো-এরিস্টটল থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আরো একটি দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শিল্পী যেখানে বিশেষকে অনুকরণ করেন সেখানে তিনি বিশেষের অনুগত, সেখানে মানসিক ক্রিয়ার স্বাধীনতা কম, আর যেখানে তিনি সামান্যকে বা সম্ভাব্যকে অনুকরণ করেন, সেখানে স্বাধীনতা অনেক বেশী। অবশ্য সব সময়েই এ কথা মনে রাখতে হবে—কোন শিল্পীই বস্তুরূপকে যথাযথভাবে অনুকরণ করতে পারেন না, শিল্পী অনুকরণ করেন—appearance কে। স্বীকার করতেই হবে বস্তুর স্বরূপ এবং বস্তুর প্রতীয়মান রূপ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে এবং থাকে বলেই স্বরূপের অনুকরণ অপেক্ষা প্রতীয়মানের অনুকরণ অনেক পরিমাণে স্বাধীন। সম্ভাব্যের অনুকরণে মন বিশেষের আনুগত্য থেকে আরো মুক্তি পায় আরো গ্রহণ বর্জনের অধিকার বা সুযোগ লাভ করে। তবে, কোন ক্ষেত্রেই অনুকরণ সামান্যকে বা বিশেষকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারে না, বিষয়-সাপেক্ষতা এড়াতে পারে না এবং তা' পারে না বলেই অনুকার্য বিশেষ বা সামান্যকে অনুকরণের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের মান হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এইটিই অনুকরণবাদের আসল তাৎপর্য। অনুকরণ শব্দটির স্থলে, প্রকাশ উপস্থাপনা প্রভৃতি শব্দের যে কোনটিই ব্যবহার করা হোক, শিল্পীর কাজ জাগতিক সত্তাকে —সে সত্তা বস্তু, জীব-প্রকৃতি, মানব প্রকৃতি যাই হোক না কেন—সে সত্তা বস্তু

রূপেই বিরাজ করুক বা ভাবাবেগ রূপেই নিজের অন্তরে বা সামাজিকদের মধ্যে থাক—কোন না-কোন সত্তাকে বা বিষয়কে রূপ দেওয়া। সব মাধ্যমে সব বস্তুকে যে রূপ দেওয়া যায় না, মাধ্যমের প্রকৃতি অনুসারে শিল্পের বিষয় স্বতন্ত্র হ'য়ে যায় এ কথা এরিস্টটল স্পষ্ট করেই ব'লে গেছেন। স্থপতি ও চিত্রকরের উপাদান ভিন্ন ব'লে উভয়ের বিষয়ও ভিন্ন। তেমনি সংগীতকার যে মাধ্যম নিয়ে কাজ করেন তা কোন মূর্তি বা ছবি নির্মাণ করতে পারে না বটে কিন্তু তা আমাদের মনে গতি সঞ্চার ক'রে আবেগকে অনুকরণ করতে পারে। সাহিত্যের উপাদান ভাষা বা সার্থক শব্দ, এই মাধ্যম বা উপাদান দিয়ে সত্তার যতখানি প্রকাশ করা সম্ভব সাহিত্য-শিল্পী ততখানিই প্রকাশ করতে পারেন, ভাস্করের মতো, চিত্রকরের মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য মূর্তি প্রস্তুত করতে পারেন না বটে, কিন্তু জীবনের গতিশীল রূপের শব্দ-চিত্র তৈরী করতে পারেন—যা' আর কেউ পারেন না। মোট কথা অনুকরণবাদীর বা বাস্তব-বাদীর কাছে 'সত্তা' (Reality) নানা স্তরে বিরাজ করছে—তাতে যেমন অজৈব বস্তুর স্তর রয়েছে, তেমনি জৈবিক আবেগ ও মনোজৈবিক চেতনার স্তরও আছে। সত্তাকে অনুকরণ করা বলতে তাঁরা শুধু বস্তু-সত্তার অনুকরণ বুঝেন না, ভাব-সত্তারও অনুকরণ বুঝেন। বিশেষের ও সামান্যের ধারণার বাইরে যাওয়ার শক্তি কোন মনেরই নেই, এবং তা' নেই ব'লেই শিল্প বিশেষের বা সামান্যের সদৃশ বা সমজাতীয় কিছু হ'তে বাধ্য। বাস্তবিকই, এমন কি রূপকথার মতো উৎকল্পনার জগৎটিও এবং চরম উৎকল্পনাময় স্বপ্নলোকটিও বাস্তব অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়েই, বাস্তবের পরিপূরক রূপেই, গড়ে উঠে থাকে। এর ভাল একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে —প্রেতলোকের অধিবাসীদের বিবৃতিতে। সিঃ ইঃ এম্‌ঃ জোয়াড তাঁর 'এ গাইড টু মডার্ণ থট' নামক গ্রন্থের 'এ্যাবনরম্যাল সাইকিক ফেনোমেনা' অধ্যায়ে 'সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির বিবরণ উদ্ধৃত করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন—মিডিয়ামকে আশ্রয় ক'রে প্রেতরা যে সব কথা বলেছে, তাতে ইহলোকের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সাহেব ভূতরা প্রেতলোকে শ্যাম্পেন ও সিগার খায়, আমাদের দেশের ভূতরাও—নিশ্চয়ই আমাদের দেশেরই খাদ্য খায়,

আমাদের দেশের নেশা করে। মোট কথা চেতনা বিষয় থেকে বিবিক্ত হয়ে থাকতে পারে না এবং চেতনা মাত্রেই বিষয়ের চেতনা, বিষয়াকারা প্রতীতির ধারণা। প্রতীতিরূপ উপাদানকে বাদ দিয়ে মন কিছু গঠন করতে পারে না এবং তা পারে না বলেই মনের সৃষ্টি বিষয়সাপেক্ষ হতে বাধ্য।

এই কারণেই অনুকরণবাদ মরেও মরছে না। রেণেশাঁস-যুগের শিল্পীদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো যেতে পারে—যথাযথ অনুকরণকেই সার্থক শিল্প ব'লে মনে করা হয়েছে। এলবের্তি তাঁর 'ট্রিটিজ অন পেইন্টিং'-এ লিখেছেন—"চিত্রকরের আসল কাব্য রেখা ও রং দিয়ে এমনভাবে কোন মূর্তি আঁকা যাতে অঙ্কিত মূর্তিটি চিত্তাকর্ষক হয় এবং মূল বস্তুটি যথাসম্ভব সদৃশ হয়।" লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চিও একই ধরনের কথা লিখেছেন—'সেই চিত্রই সব চেয়ে প্রশংসনীয় যার অনুকৃত বস্তুটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্য থাকে।' ভাসারীও একই ধরনের উক্তি করেছেন।

শিল্পের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাবো—বাস্তববাদের ধারণাটি রোমান্টিক আন্দোলনের চাপে সাময়িকভাবে ক্ষীণপ্রভ হ'য়েছিল বটে, কিন্তু কখনই তিরোহিত হয়নি। রোমান্টিকরা শিল্পকে প্রকৃতির অনুকরণরূপে দেখতে চাননি; তাদের কাছে—শিল্প হ'ল—শেলিঙের বাক্যে—বলা যাক the holy eternally creative elemental power of the world which generates all things out of itself and brings them forth productive। তাঁদের কাছে শিল্প হ'ল—সামান্য ও বিশেষের, আত্মার ও দেহের essence ও existence-এর সেতু বন্ধন। আমাদের দেশে যাকে বলা হ'য়েছে, আত্মসংস্কৃতি, আত্মার অনন্ত লীলা তাই। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাইনে। এ বিষয়ে হার্বার্ট রিড মহাশয় তাঁর—দি ট্রু ভয়েস অফ ফিলিং-গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন সেইটি উল্লেখ ক'রে মূল ধারায় ফিরে যাবো। তিনি লিখেছেন—I do not wish to ignore the fact that the theory, as expounded by Coleridge and Schelling has a transcendental

and even a mystical element in it ..and in so far as the theory endows the artist with special powers of revelation, it must be treated as a metaphysical speculation ॥ বিশ্বের মূলীভূত সৃজনী শক্তি আপন সম্ভাবনা থেকে বিষয় সৃষ্টি ক'রে ক'রে চলেছে, শিল্পীরাও সেই সৃজনী শক্তিরই শক্তিমান কেন্দ্ররূপে আত্মার অনন্ত সম্ভাবনা থেকে বিষয় উদ্ভাবন ক'রে ক'রে চলেছেন—প্রকৃতির কাছে তার কোন আনুগত্য নেই, প্রাকৃতিক বস্তুই তার সৃষ্টির প্রতিমান নয়। এ এক দৈব উপলব্ধি—এ এক দৈব বাণী।

দার্শনিক আইডিয়ালিজিম এবং তারই শৈল্পিক আন্দোলন রোমান্টিসিজিমের এই আবেশ উদ্দীপনা, বেশী দিন স্থায়ী হ'তে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যক্ষবাদের (পজিটিভিজিম্) পৃষ্ঠপোষকতায় বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠায় বাস্তববাদী শিল্পদর্শন আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। বাস্তববাদী শিল্পদর্শনের প্রথম ঘোষণা উচ্চারিত হ'ল চিত্রকর কার্বের কণ্ঠে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যে চিত্র-প্রদর্শনী হ'য়েছিল তা'তে তার চিত্রকে স্থান না দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি প্রদর্শনীর প্রবেশপথের পাশে নিজের আঁকা চিত্রের একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিজ মত প্রচার করতে গিয়ে লিখেছেন—'দৃশ্য ও স্পৃশ্য বস্তুর উপস্থাপনার মধ্যেই চিত্রকলার সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকা উচিৎ···আমি এই ধারণাই পোষণ করি চিত্রকলা আসলে বাস্তব শিল্প এবং একমাত্র বাস্তব ও সত্য বস্তুর উপস্থাপনাই তার আসল কাজ।' পজিটিভিজিমের প্রভাবে যে প্রত্যক্ষ-প্রীতি প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, তা' শুধু চিত্রকলাশিল্পীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি সাহিত্যিক ও সমালোচকদেরও বাস্তববাদী ক'রে তুলেছিল। প্রুধোঁ তাঁর বড় দৃষ্টান্ত। প্রুধোঁ তাঁর "দ্য প্রিনসিপে দেল্ লা'-আর্ত" এ (১৮৬৫ খ্রীঃ) কার্বের 'সোসাল ডকুমেণ্টেশান' মতবাদকে সমর্থন করে, তবে সঙ্গে এইটুকু জুড়ে দিয়েছিলেন যে "সামাজিক দলিল" সমাজ সমালোচনায় রূপ নেবে এবং ঐ সমালোচনা থেকে নতুন সমাজ সৃষ্টির বাসনা জাগবে। অবশ্য এ কথা বলতেই হবে—রোমান্টিক আন্দোলনের ঢেউ, বাস্তববাদের তরঙ্গের সমান্তরালেই চলছিল এবং এখনও

তা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে, বিশেষতঃ শেষ দুতিন দশকে, ভাববাদী ও বস্তুবাদী সংস্কারের দ্বন্দ্বের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দুই শিবিরেই বড় বড় যোদ্ধা রয়েছেন। ভাববাদীরা শিল্পকে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির মাধ্যমে পরিণত করতে সচেষ্ট, বাস্তববাদীরা শিল্পকে সমাজ সমালোচনার মাধ্যমে এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের হাতিয়ারে পরিণত করতে ব্যগ্র। এই সময়ে একদিকে দেখা যায় রিয়েলিজিম ও নেচারালিজিম—ভক্তদের, অন্যদিকে সিম্বলিজিম ভক্তদের—অতীন্দ্রিয়রহস্যবাদীদের॥ একদিকে জীবনবাদীদের অন্যদিকে কলাকৈবল্যবাদীদেব। এই দীর্ঘ ও ব্যাপক দ্বন্দ্বের ইতিহাস বিবৃত করে আপনাদের ধৈর্যকে পীড়িত করব না। বাস্তববাদী ধারার গতিপরিণতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেই, বাস্তববাদী মতবাদের আধুনিক স স্বরূপ—সংকেতবাদ ও শিল্প সত্যের প্রকাশ, এই মতবাদের আলোচনায় প্রবেশ করব। বাস্তববাদীরা সকলেই যে একই রকম বাস্তবতা চেয়েছেন তা নয়। কেউ মানুষের ধর্মকে জৈবিক বাসনা কামনার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছেন—'বায়োলজিকাল রিয়েলিজিম-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছেন, কেউ মনস্তত্ত্বের দিকে—মনের রহস্য উদঘাটনে, মনের বাস্তব রূপটি উপস্থাপন করতে—ঝোঁক দেখিয়েছেন। কেউ বা প্রুধোঁর মত "সোসাল ডকুমেনটেশান" তৈরি করতে, শ্রেণীদ্বন্দ্বের অর্থাৎ শোষক শোষিতের সম্পর্কের রূপ নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। জৈবিক প্রকৃতির দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়ায় কেউ কেউ যেমন মানুষের অন্যান্য প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেছেন, তেমনি মনের বাস্তব রূপটিকে উদ্ধার করতে গিয়ে কেউ কেউ প্রচলিত বাস্তবতার সীমা পেরিয়ে, সুররিয়েলিজিম—ইম্প্রেশানিজম—এক্সপ্রেশানিজিম প্রভৃতির স্তরে পৌঁছে গেছেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রশিল্পে বাস্তববাদীদের নেতা রূপে দেখা দিয়েছিলেন প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী ম্যানেট। এই ম্যানেটই ইম্প্রেশানিজিম নামক মতবাদের প্রবর্তক। মতবাদটি নামে নতুন হলেও, মূলতঃ বাস্তবতা চাহিদারই পরিণাম বিশেষ। কার্বে বলেছিলেন প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত সৌন্দর্য সঞ্চিত আছে, শিল্পীর কাজ তাঁকে আবিষ্কার করা এবং আবিষ্কার

করার পরে যথাযথভাবে তাকে রূপ দেওয়া। কিন্তু ম্যানেট ও ম্যানেটপন্থী ইম্প্রেশানিষ্টরা সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামাতে চাননি। (পিসারে বা সিউরাট শব্দটি একবারও ব্যবহার করেননি, সিগনাক দু'বার মাত্র ব্যবহার করেছিলেন) মাইকেল ইউজিন চেগুরুল (১৮৩৯) এবং ওগডেন নিকলাস রুডের (১৮৭৯) বর্ণতত্ত্ব গবেষণার ও আবিষ্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, দেখার সময় আমরা যথার্থতঃ কি দেখি, তা ভালভাবে বুঝবার দিকে এবং যা দেখা হয় তাকে উপস্থাপিত করার আরো নিখুঁত কৌশল আবিষ্কার করার দিকে তাঁরা মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে আমরা একই বিষয়ের দিকে, একই গাছ একই পাহাড় বা একই জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি এবং যতবারই দেখি না কেন একই বস্তু বলে চিনতেও পারি; কিন্তু আমাদের প্রতীতি কখনই একরূপ থাকে না, আলোকের ও আবহাওয়ার অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখার মধ্যেও পার্থক্য ঘটে যায়। আমরা যা' দেখি তা' হচ্ছে বস্তুর কয়েকটি আলোকিত উপরিতল এবং দেখি আলোকেরই সাহায্যে। এই সংস্কার বশেই ইম্প্রেশানিষ্টরা কোন-কিছুর বাঁধাধরা রূপকে প্রকাশ না করে, বিষয়টি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে এসে যে প্রতীতিতে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ আকৃতির বর্ণরঞ্জিত উপরিতলের গতিশীল নির্দিষ্ট ধাঁচটি, এক কথায়—Sense impression-কে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন।

যে চিত্র স্বভাবে স্থিতিশীল তা'তে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল রূপকে ধরবার এই চেষ্টা, চিত্রের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে দেওয়ার এই সাধনা প্রশংসনীয় হলেও, অনেকেই একে Wrong ideal 'impossible ideal' বলে নিন্দা করেছেন এবং এই যুক্তিতেই করেছেন যে বস্তুস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় এবং তা নয় এই কারণেই যে প্রত্যক্ষকালে মনের নির্জ্ঞান বাসনা ও উদ্দেশ্য দৃষ্টিক্ষেত্রটিকে নিজের মতো করে গুছিয়ে নিয়ে থাকে। সে যাই হোক বাস্তবতার কেন্দ্রে পৌঁছতে গিয়ে ইম্প্রেশানিষ্টরা শুধু বস্তুর উপরিতলের প্রতীতিতেই আবদ্ধ থাকলেন না পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে আয়ত্ত করতে গিয়ে—

শিল্পকে নৈর্ব্যক্তিকতার দিকেই এগিয়ে নিয়ে গেলেন তথা বাস্তবতাবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করে দিলেন। শিল্প সম্বন্ধে আধুনিক ধারণাটি—অর্থাৎ শিল্প অভিজ্ঞতালব্ধ কোন বিষয়কে প্রকাশ করবে না, অপূর্ব এবং অবস্তুবস্তুকিঞ্চিং তৈরি করবে, বিষয়শূন্য বিমূর্ত রূপ কল্পনা করবে—ঐ আন্দোলনেরই ক্রমপরিণতি সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই একই ইতিহাস দেখা যায়। সংজ্ঞান আসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান স্তর নিয়ে মনের সমগ্রতা—মনের বাস্তব রূপ। এই সমগ্রতাকে সাহিত্যে ব্যক্ত করবার চেষ্টা থেকেই স্যুররিয়েলিজিম, ডাডাইজিম, এক্সপ্রেশানিজিম প্রভৃতি মতবাদের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু মনের সংজ্ঞান-আসংজ্ঞান নির্জ্ঞান স্তরের পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখাতে গিয়ে সাহিত্যিকরা বাস্তবতা বিরোধী আন্দোলনকেই পুষ্ট করে তুললেন—উদ্ভট সাহিত্যের সৃষ্টি এই আন্দোলনেরই এক বিকৃত পরিণাম।

তবে চিত্রে ও ভাস্কর্যে বিমূর্ত রূপের এবং সাহিত্যশিল্পে এ্যাবসার্ড রীতির প্রাধান্য যতই ঘটুক না কেন, বিষয়শূন্য সৃষ্টির সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে। নিরালম্ব হয়ে মন যে কাজ করতে পারে না একথা প্রায় প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হ'য়েছে। এমনকি চিত্রকলা জগতের সবচেয়ে বিমূর্ত শিল্পের স্রষ্টা প্যাবলো পিকাসোও স্বীকার করেছেন—'প্রথমে তোমাকে কোন কিছু অবলম্বন করেই আরম্ভ করতে হবে। তারপর তুমি একে একে বস্তুলক্ষণগুলি অপসারিত করতে পার। তখন কোন বিপদ নেই; কারণ বস্তুর ধারণাটি ততক্ষণে মনের মধ্যে গভীরভাবে মুদ্রিত হ'য়ে গেছে। ঐ বস্তুটিই প্রথমে শিল্পীর মধ্যে প্রেরণা এনেছে। তার ধারণাকে উত্তেজিত করেছে এবং তার আবেগ উদ্রিক্ত করেছে। শেষ পর্যন্ত ধারণা এবং আবেগ তাঁর রূপকর্মের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়বে।' পিকাসোর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। বস্তু ধারণা নিয়েই শিল্পী সৃষ্টি কর্মে প্রবৃত্ত হন, শেষ পর্যন্ত বস্তুটিকে মনোমত রূপের অন্তরালে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ ভাবকে রূপের মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া—অঙ্গ দেওয়া শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করা যেতে পারেঃ

দ্বিতীয়তঃ বস্তুকে তার স্বাভাবিক রূপে উপস্থাপিত না করলেই প্রকৃতিকে অস্বীকার করা হয় কি? 'তা হয় না'—পিয়েট মড্রিয়ান বলেছেন—"নৈর্ব্যক্তিক শিল্প বস্তুর স্বাভাবিক উপস্থাপনার বিপরীত হ'তে পারে, কিন্তু প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়"। মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, বস্তুকে আদল হিসাবে না নিলেও, বস্তু ধারণাকে আদল হিসাবে অস্বীকার করা হচ্ছে না এবং তা না করলে, স্বীকার করতেই হবে—আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক শিল্প, প্রকৃতির গভীরতর বাস্তবতার স্বরটিকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করছে। এই যুক্তিতে নৈর্ব্যক্তিক শিল্পকে বাস্তবতার গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনতে অনেকেই চাইবেন না, বিশেষতঃ শিল্পীরা তো চাইবেনই না। কারণ বিমূর্ত রূপ বা প্যাটার্ন তৈরি করা যত সহজসাধ্য ব্যাপার, সব্যক্তিক রূপ নির্মাণ করা তত সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সে যাই হোক না কেন এ কথাটি কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিল্পের সঙ্গে বাস্তব-অভিজ্ঞতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য—এই ধারণাটি বহু আক্রমণের আঘাতেও মরছে না। অনুকরণবাদ আজ নতুন নামের পোষাক পরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই নামের মুখোস খুললে দেখা যাবে—অনুকরণবাদের তাৎপর্য এবং এই সব মতবাদের তাৎপর্য প্রায় একই। একই বলছি এই কারণে যে অনুকরণবাদের মতো এরাও বৃত্তি ও বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য—বিষয়কে প্রকাশ করা শিল্পের উদ্দেশ্য এবং বিষয়ের বৈশিষ্ট্য কতখানি প্রকাশের বা রূপের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে না হয়েছে তার হিসাব করে রূপের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করে থাকে। সংক্ষেপে বললে বলা যায়—অনুকরণবাদীর মতো এদের দৃষ্টিভঙ্গীও 'Referential'।

আধুনিক পরিচ্ছদে—বাস্তবতাবাদ

আগেই উল্লেখ করেছি—শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসে রূপকে স্বমহিমায় দেখার এবং রূপকে বিষয়গত করে দেখার দুই প্রবণতা সমান্তরালভাবে চলে আসছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে দেখা যায়—রূপকে বা সৌন্দর্যকে বিষয়বস্তুসাপেক্ষ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জেগেছে। প্রকৃতির মধ্যেই সব সৌন্দর্য ধরাবাঁধা রূপ নিয়ে

বিরাজ করছে, শিল্পীর কাজ তাকে দেখা ও যথাযথভাবে ব্যক্ত করা—এই ধারণাকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করা হয়েছে। ম্যাকনিল হুইসলার 'দি জেণ্টেল আর্ট অফ মেকিং এনিমি' (১৮৯০) গ্রন্থে অতি স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় ঘোষণা করেছেন প্রকৃতি সৌন্দর্য তৈরি করার কাঁচামাল ছাড়া আর কিছুই যোগায় না। প্রকৃতিতে ছবির উপাদান সেই পরিমাণেই থাকে যে পরিমাণে পিয়ানোর পর্দাগুলিতে সংগীতের উপাদান থাকে……'প্রকৃতি যেমনটি আছে তেমনিভাবেই তাকে গ্রহণ কর'—কোন চিত্রশিল্পীকে একথা বলা আর পিয়ানোবাদককে পিয়ানোর উপরে বসতে বলা একই কথা। যাই হোক শিল্পীর কাজ নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত উপাদান দিয়ে একটি সমগ্র ও সমন্বিত রূপ তৈরি করা এ কথা বহুপূর্বেই স্বীকৃত হয়েছে, এ নিয়ে তেমন কোন বিসংবাদ নেই ; আসল বিবাদ যার সঙ্গে আগেই তার সঙ্গে অল্পস্বল্প পরিচয় ঘটেছে—শিল্প কোন-কিছুর প্রকাশ না উপাদান বিন্যাসের কৌশল মাত্র এই প্রশ্ন নিয়েই যত বাদবিসংবাদ। পরে এই প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। এখন দেখা যাক, বাস্তবতা কি কি নতুন রূপ ধরে আমাদের সামনে এসেছে। হুইসলারের 'শত্রু তৈরি করার ভদ্র কলা' (১৮৯০) প্রকাশের কাছাকাছি সময়েই 'ফভিষ্ট' নামে পরিচিত বিশেষ এক সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের বক্তব্য হল—শিল্পী শুধু প্রকৃতিদত্ত উপাদানগুলি নির্বাচিতই করেন না এবং তাদের সংযোগে সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টাই করেন না, তা করতে চেয়ে এমনভাবে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেন, যাতে শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে তিনি অপরের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যান ও আবেগ প্রকাশ করে থাকেন। মাতিসে (১৯০৮) বললেন—সব কিছুর উপরে আমি পেতে চাই—প্রকাশ (Exprssion) আমার ছবির শেষ ফল হল—প্রকাশ। প্রকৃতিকে—যথাযথ-ভাবে অনুকরণ করা সম্ভব নয়, কারণ আমি প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে ও আমার ছবির মূল ভাবের—Spirit-এর অনুগত করতে বাধ্য। এখানে লক্ষ্য করা দরকার—শিল্পী সব উপাদানকে মূলভাবের অধীন করে প্রকাশ করেন অর্থাৎ প্রকাশ বলতে শেষ পর্যন্ত মূলভাবেই প্রকাশ বুঝায়। এই মতবাদটি—

এক্সপ্রেশানিষ্ট বা প্রকাশবাদী মতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদ—অনুসারে, শিল্প হ'ল আত্মপ্রকাশেরই উপায় বিশেষ—অনুভূতি আবেগের ভাষা, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিকে ব্যক্ত করবার উপায়।

এই মতবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে 'ব্যক্তিগত ধ্যান ও আবেগ' অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি প্রভৃতি শব্দের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মতবাদটি যে দোমনা একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে। এর এক চক্ষু নিবদ্ধ রয়েছে জগতের দিকে আর এক চক্ষু প্রসারিত রয়েছে অতীন্দ্রিয় অতিজাগতিক রহস্যের দিকে। 'ব্যক্তিগত ধ্যান ও আবেগ' কথাটিকে সহজ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে মতবাদটি বিষয়কে উপেক্ষা করছে না, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই— বিশেষ করে 'অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি' 'রহস্যানুভূতি' প্রভৃতির দিকে তাকালে, মতবাদটির ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী ঝোঁক ধরা পড়ে যাবে। ব্যক্তিগত ধ্যান ও আবেগকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, বলাবাহুল্য, তার উপরে সব কিছু নির্ভর করছে। ব্যক্তিগত ধ্যানকে অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বলে মনে করলে, মনের অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ ধ্যান সামর্থ্য স্বীকার না করলে ধ্যানকে বাস্তবের ধ্যান বলেই, আবেগকে বাস্তবোপলব্ধিজনিত বলেই মনে করতে হবে। তখন প্রকাশবাদ বাস্তববাদেরই রকমফের হবে। কিন্তু মনের ধ্যানক্ষমতাকে আ-প্রিয়রাই অর্থাৎ অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বলে স্বীকার করলে, ধ্যানকে জাগতিক বিষয় নিরপেক্ষ বলে মনে করলে, প্রকাশবাদ ট্র্যানসেনডেন্টালিজিমের নামান্তর হবে।

অবশ্য এই মতের পাশাপাশি বিমূর্তবাদী চিন্তাকেই পাওয়া যায়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মরিস ডেনিস একটি বিপ্লবাত্মক মন্তব্য করেছিলেন—অবশ্যই একথা মনে রাখতে হবে, একখানি ছবি কোন একটি যুদ্ধাশ্বের বা বিবস্ত্রা নারীর অথবা কোন ঘটনার ছবি হওয়ার আগে, বস্তুতঃ বিশেষ ধরনে-বিন্যস্ত বর্ণের একটি সমতল ক্ষেত্র। 'কিউবিষ্ট' নামক সম্প্রদায়ের এই আন্দোলন আর একটু এগিয়ে গিয়ে শিল্পের নতুন একটি ধারণায় পরিণত হ'ল। ধারণাটি এই যে—শিল্পীর কাজ প্রকৃতিকে অনুকরণ করা নয়, অথবা প্রাকৃতিক উপাদানকে সাজিয়ে গুছিয়ে

সুন্দর রূপের পরিকল্পনা করা নয়, শিল্পীর আসল কাজ সম্পূর্ণ নতুন এমন কিছু তৈরী করা যা' অন্য কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য দ্বারা নয়, নিজ রূপ-মহিমা দ্বারাই মনোযোগ ও সম্মান আকর্ষণ করবে। এই কথার তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে এই যে শিল্পী যে রূপ সৃষ্টি করবেন তা বিষয় সাপেক্ষ নয়, তা' বিষয়নিরপেক্ষ রূপ, তা' অপূর্ব বস্তু বিশেষ এবং ঐ রূপের মূল্য রূপের মাপকাঠি ছাড়া আর কিছু দিয়ে করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে পরে, 'কনফিগারেশান' মতবাদ আলোচনার সময় বিশদ আলোচনা করা হবে এখানে এ সম্বন্ধে এই পর্যন্তই। তবে মূল বিষয় বাস্তবতার প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া'র আগে 'এক্সপ্রেশানিজিম' বা প্রকাশবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে যা' বলেছি তা শোনার পরে কারো কারো মনে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে—ক্রোচের মতটিও তো সাধারণভাবে 'এক্সপ্রেশানিজিম' নামে পরিচিত। Art is expression শুনলেই আমাদের ক্রোচের কথা মনে পড়ে এবং expression এবং প্রকাশকে আমরা সমার্থক ব'লে মনে করে থাকি। এখানেই সতর্ক করে দেওয়া ভাল—ক্রোচে যে অর্থে শিল্পকে 'এক্সপ্রেশান' বলেছেন, প্রকাশ ব'লতে ঠিক সে অর্থ বুঝায় না। আমরা যাকে প্রকাশ বলি ক্রোচের মতে 'তা' হচ্ছে Externalization—মনের মধ্যে প্রতিভাত রূপকে বাইরে বস্তুর আধারে উপস্থাপিত করা, বাহ্য আকৃতি দান করা। ক্রোচের মতবাদটিকে আমরা সৃজনশীল কল্পনাবাদের বা প্রতিভানবাদের আলোচনাকালে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করব; এখানে শুধু শিল্পকে প্রতিভান বললে, সৃজনশীল কল্পনার সৃষ্টি অর্থাৎ রূপকর্ম বিশেষ বললে বাস্তববাদী প্রবণতা অথবা বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখানো হয়, সেই সম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে চাই। ক্রোচের প্রতিভানবাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে শিল্প অন্যতম জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া—প্রাতিভানিক জ্ঞান অর্থাৎ যা রূপকল্প তৈরি করে বিশেষের জ্ঞান, এইদিকে নৈয়ায়িক জ্ঞান থেকে অন্যদিকে আর্থনৈতিক ও নৈতিক ক্রিয়া থেকে—দ্বিবিধ কর্মাত্মিকা ক্রিয়া থেকে এ পৃথক। আত্মার গহনে অবস্থিত প্রতীরাজি সংশ্লিষ্ট হয়ে মনের মধ্যে আকৃতি নিয়ে ফুটে উঠে। এ

এমন এক জ্ঞানের মুহূর্ত যাতে দেশকালপাত্রচেতনা, বাস্তব-অবাস্তব চেতনা কোন কিছুই থাকে না, থাকে শুধু একটি প্রতিভান বা ধ্যান। এই কারণেই শিল্পের সঙ্গে সত্য, উপযোগ ও নীতির কোন সম্পর্ক নেই। শিল্প কল্পনা-কল্পিত একটি রূপ যা' সর্বতোভাবে অপূর্ব ও অসদৃশ। শিল্পীর কাজ কোন নির্দিষ্ট বাহ্য বস্তুকে উপস্থাপিত করা বা' ধারণাকে রূপায়িত করা নয় এবং তা' নয় বলেই কোন বাহ্য বস্তুর সাদৃশ্যকে রূপকল্পটির ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ড করা সম্ভব নয়। একমাত্র কল্পনার পরাদর্শের মানদণ্ডেই প্রতিভানের বিচার সম্ভব। দেখা যাচ্ছে ক্রোচের প্রতিভানবাদ বা প্রকাশবাদ আলোচ্য বাস্তববাদের বিপরীত প্রবণতা, কারণ বাস্তব কোন কিছুকে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব থেকে শিল্পীকে এ মুক্তি দিয়েছে। যদিও একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে ক্রোচে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে Without matter spiritual activity would not forsake its abstractness to become concrete and real activity this or that spiritual content this or that definite intuition "অর্থাৎ বিষয় না থাকলে চেতনা নৈর্বক্তিক অবস্থা থেকে মুক্ত হতে নির্দিষ্ট ও বাস্তব আত্মিক ক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের চেতনা—নির্দিষ্ট প্রতিভান হতে পাবে না"। তবু একথা না মেনে উপায় নেই যে প্রতিভানবাদে বস্তুর মর্যাদা একেবারেই স্বীকার করা হয়নি, বাস্তবকে প্রতীতির স্তরে সীমাবদ্ধ করে রেখে অসৎ পদার্থে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। মোটকথা রোমান্টিকদের প্রকাশবাদ এবং ক্রোচের প্রকাশবাদের মধ্যে আপাত সাদৃশ্য কিছু কিছু থাকলেও দুটি মতবাদ এক নয়; সে যাই হোক, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের প্রতিভানবাদী প্রবণতা যত প্রবলই হোক, বাস্তববাদী প্রবণতাকে কোণঠাসা করতে পারেনি। তৃতীয় দশকের সি. কে. ওগডেন এবং আই. এ. রিচার্ডসের রচনায় এবং পরবর্তীকালে সুসান কে ল্যাঙ্গার, মিঃ টমাস ক্লার্ক পোলোক, মিঃ জন হস্পার্স, থেয়োডোর মেয়ার গ্রীন প্রমুখ মনীষীদের রচনায় শিল্পতত্ত্বে বাস্তববাদী সংস্কার প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং

সংকেতবাদ (**Art as symbol**) এবং শৈল্পিক সত্য (**Artistic truth**) মতবাদের রূপ ধরে বাস্তববাদ প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেছিল। প্রথমতঃ সংকেতবাদের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যাক। সংকেতবাদীদের কাছে শিল্প হল ভাববিনিময়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সংকেত বিশেষ। সেমাণ্টিকসের পরিভাষায়, যখন কোন একটি বস্তু অন্য কোন বস্তু বুঝাতে ব্যবহৃত হয়, তখন ঐ বস্তুটিকে বলা হয় চিহ্ন (সাইন) এবং যে বস্তুটিকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় চিহ্নের অর্থ (*রেফারেণ্ট) 'চিহ্ন' এবং 'সংকেত' দুটি ভিন্ন পর্যায়ের বিষয়। চিহ্ন থেকে সংকেতের পার্থক্য এখানেই যে সংকেত ব্যাখ্যা করতে ধারণা অপেক্ষিত, কোন রেফারেণ্ট দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত সংকেত প্রত্যক্ষভাবে সেই প্রতিক্রিয়া জাগায় না, জাগায় একটি ধারণাকে যা সংকেতের 'রেফারেণ্ট'—সুসান কে ল্যাঙ্গারের ভাষায় বললে— **Symbols are not proxy for their objects, but are vehicles for the conce tion of the objects**। অর্থাৎ সংকেতগুলি বস্তুরাজির পরিবর্ত নয়, বস্তু ধারণার বাহন। সংকেত ব্যবহারেই মানববুদ্ধির প্রারম্ভ। সংকেতকে এরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—এক প্রথাবদ্ধ (কনভেনশানাল) দুই অর্ধপ্রথাবদ্ধ (সেমি-কনভেনশানাল) এবং তিন—প্রাকৃতিক (নেচারাল) এই তিন প্রকার সংকেত ব্যবহার করে মানুষ আপন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করে থাকে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ সি. কে. ওগডেন এবং মিঃ আই. এ. রিচার্ডস **'Meaning of Meaning'** নামে যে গ্রন্থখানি লিখেছিলেন, সাহিত্য সমালোচনা দর্শনের উপরে তার প্রভাব অপরিসীম বলে, অতি সংক্ষেপে আমি তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ এখানে উপস্থাপিত করতে চাই। তাঁদের আসল বক্তব্য এই ভাষা ব্যবহারের দুই রীতি। একটি হল—রেফারেনশিয়াল অর্থাৎ অর্থসূচক, অন্যটি—"ইমোটিভ" অর্থাৎ আবেগোদ্দীপক। যখন ভাষা দিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয় বা এমন কোন সংবাদ দেওয়া হয় যাকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করা চলে, তখন বুঝতে হবে ভাষার অর্থসূচক বা রেফারেনশিয়াল ব্যবহার হচ্ছে,

আর যখন ভাষা দিয়ে অপরের মনে আবেগ জাগানর চেষ্টা করা হয় তথা অপরের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয় তখন ভাষার 'ইমোটিভ' ব্যবহার। আই. এ রিচার্ডসের তাঁর বিখ্যাত "Principles of literary criticism" গ্রন্থে এই বিভাগেব ভিত্তির উপরে সাহিত্যশিল্পতত্ত্বের ও সাহিত্য সমালোচনার বহু সম্মানিত বিধিবিধান রচনা করেছেন এবং মূল্যের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা (Psychological theory of value) প্রতিষ্ঠিত করে, সাহিত্যকে আবেগজনক ভাষা, আমাদের পরিভাষায় 'রসাত্মক বাক্য' বলে প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছেন। আই. এ. রিচার্ডসের অনুসরণে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'সাহিত্যের প্রকৃতি" (The nature of literature) নামক গ্রন্থে, টমাস ক্লার্ক পোলোক মহাশয় সংকেতবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি রিচার্ডসের এবং ওগডেনের শ্রেণী বিভাগ আংশিকভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং ভাষা ব্যবহারকে—'রেফারেনশিয়াল' এবং 'ইভোকেটিভ' এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। রেফারেনশিয়াল ব্যবহারে মানুষ তথ্যগত ও তত্ত্বগত অভিজ্ঞতাকে অপরের কাছে প্রকাশ করে এবং করে শুধু অর্থের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যেই। আর 'ইভোকেটিভ' ব্যবহারে মানুষ তার বিশেষ একটি অভিজ্ঞতাকে মানসিক ঘটনারূপেই উদ্রিক্ত করতে চেষ্টা করে। অভিজ্ঞতাকে জানানো এবং অভিজ্ঞতাকে জাগানো, বলা বাহুল্য, দুটি ভিন্ন ব্যাপার। প্রথমটিতে অভিজ্ঞতা সংবাদ হিসাবে পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয়টিতে অভিজ্ঞতা স্বরূপতঃ ব্যক্ত হয় দ্বিতীয়টিতে—হার্বার্ট রিড মহাশয়ের ভাষায় বলা যেতে পারে "The function of form is symbolical, the form is a perceptible symbol for a particular state of mind" (১৫৩ পৃষ্ঠা—দি ট্রু ভয়েস অফ ফিলং)। এই মতবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে হ্যারোল্ড ওসবোর্ণ লিখেছেন "In the context of a general theory of semantics it does then seem moderately sensible to say that.

both literary art and representational visual art are **mimetic**, both communicate experienced situations real or imaginal by means of conventional symbols and visual art mainly by natural symbols. Nor does it seem so completely nonsensical as before to say that literature imitates that which it describes" (৭৩ পৃঃ এস্থেঃ এ্যাণ্ড ক্রিটি...) এই উক্তিটির সারাংশ এই যে সাহিত্য শিল্পই হোক আর উপস্থাপনাত্মক দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্পই হোক সব শিল্পই দৃষ্টি ও শ্রুতি-গৃহীত প্রতীতিকে অপর দশজনের কাছে প্রচার করে। সাহিত্য প্রচার করে প্রথাসম্মত সংকেতের সাহায্যে। এই দিক থেকে দেখলে সাহিত্যশিল্প ও দৃষ্টিগ্রাহ্য উপস্থাপনাত্মক শিল্প অনুকরণধর্মী। সংকেতবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—এই দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে—সাহিত্য-শিল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে—'আবেগ' বা particular state of the mind ও উপলব্ধি (experience) এবং সংকেত হচ্ছে ঐ ভাবাবেগ প্রকাশের উপায় বা বাহন (Instrument)। এই আবেগ ও উপলব্ধ বিষয় যেহেতু বাস্তব সত্তারই বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা রূপ, যেহেতু প্রত্যেক মানুষেরই মনে ভাববন্ধের ধারণা ও বিষয় রূপের ধারণা বর্তমান, সংকেতবাদ সংকেত বা রূপকে যেমন নিরপেক্ষ বলে মনে করে না, তেমনি ঐ সব ধারণা বা উপলব্ধিকেই সংকেতের মূল্য বিচারের মানদণ্ড হিসাবে স্বীকার করে। এখানেই বলে রাখা ভাল প্রকাশবাদ ও সংকেতবাদের সঙ্গে শিল্প ভাবাবেগের প্রকাশ বা সঞ্চারণ এই মতবাদটির বেশ ঐক্য রয়েছে এবং উভয়েই উদ্রিক্ত ভাবাবেগের মাত্রা হিসাব করে শিল্পের সার্থকতার মাত্রা নিরূপণ করে থাকে। অবশ্য মিঃ পোলোক আই এ রিচার্ডসের 'ইমোটিভ' শব্দটির জায়গায় 'ইভোকেটিভ' শব্দটি প্রয়োগ করায়, শিল্পের উদ্দেশ্যের গণ্ডী আবেগের সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকে অভিজ্ঞতার ব্যাপকতর পরিধিতে সম্প্রসারিত হয়েছে—এবং আবেগবাদের পরিবর্তে অভিজ্ঞতাবাদের উপরে—শিল্প হল heightened experience' এই সংজ্ঞার উপরে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। তাঁর ফলে,

শিল্পসমালোচনা আই. এ রিচার্ডসের "Psychological theory of Value"র প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত হ'য়ে—সমাজনীতি—নীতি-ও ধর্মনীতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। মিঃ পোল্লোক লিখেছেন—শিল্পসমালোচক "Will judge the value of an experience evoked by literature in the ways he judges the values of other experiences. He will, that is, judge the value of a work of literature in the last analysis in relation to (i) his own immediate personal needs for experience and (ii) the general socio-ethical system which he really as distinct from verbally, accepts and on the basis of which he makes the actual choices, which determine, so far choices can, the quality of his life. In other words a critic will normally consider 'good' a book which give him an experience answering the needs of his beeing at the moment or which would be judged good by the socio-ethical —religious standard by which he really lives"। বলাবাহুল্য মিঃ পোল্লোক শিল্পকে আবেগ সত্তার প্রকাশ হিসাবে না দেখে, উপলব্ধির প্রকাশ হিসাবে গণ্য করছেন এবং উপলব্ধির ভালমন্দ বিচার করতে রূপবহির্ভূত মান —সমাজনীতি, নীতি ও ধর্মনীতির আদর্শকে ব্যবহার করছেন। আমি মনে করি এ সম্বন্ধে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—যে সব মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হল তারা আসলে 'রেফারেনসিয়ালিষ্ট' অর্থাৎ বিষয়সাপেক্ষ রূপে বিশ্বাসী।

এবার তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করা যাক যাঁরা শিল্পকে সত্যেরই সাকার অবতার ব'লে—art কে 'truth' ব'লে মনে করে থাকেন। এদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে শিল্পের বাইরের রূপ যাই হোক, শিল্প, বিশেষ করে সাহিত্য, জীবনের গভীরতর সত্যকে তথা বাস্তবতাকেই ব্যক্ত করে থাকে। এক. এল লুকাস মহাশয় তাঁর ট্রাজেডি নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাকে সামনে রেখে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। তিনি লিখছেন "অজ্ঞাত

শিল্প সুন্দর হতে পারে কিন্তু ট্র্যাজেডি বলতে আমরা এমন কিছু বুঝি যা মূলতঃ জীবন-সত্য (true to life)। সমগ্র সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু সত্য তাকে হতেই হবে।" এই সত্য নিশ্চয়ই দর্শন বিজ্ঞানের সত্যের মত তত্ত্বসর্বস্ব নয়, তবে কী এই সত্যের স্বরূপ তা নিয়ে কথাকথান্তর অনেক হয়েছে, অনেক জল ঘোলা হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে এই সত্যের দু'টি ব্যাখ্যা সম্ভব :—একটি এই যে, উপস্থাপনা ধর্মী শিল্প প্রাকৃতিক অথবা প্রথাসম্মত সংকেতের দ্বারা গঠিত বলে এবং এক মানুষের অভিজ্ঞতাকে অন্য মানুষের কাছে প্রকাশ করে বলে অবশ্যই, বাস্তব ও সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে বেশীকম ঘনিষ্ঠ যে উপলব্ধি তাকেই প্রকাশ করে থাকে। দ্বিতীয় অর্থটি অনেক পরিমাণে আধ্যাত্মিক রহস্যে আবৃত। কেউ কেউ মনে করেন—যে শিল্পের কাজ সংকেতের সাহায্যে কোন অভিজ্ঞতাকে প্রচার করা নয়, শিল্পের কাজ এমন আবেগ উদ্রিক্ত করা যার মূলে পরম সত্তার উপলব্ধি ওতপ্রোতভাবে কারণরূপে যুক্ত থাকে এবং ঐ সত্তাকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই ব্যাখ্যা শৈল্পিক সত্যের আধ্যাত্মিকতা নির্ভর ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যার নামে খানিকটা রহস্য সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং এই অর্থকে উপেক্ষা করে, প্রথম অর্থ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা যাক। প্রথমতঃ এ কথা সকলেই মানেন ও জানেন যে সত্য বলতে ঘটনাগত সত্য বা ঐতিহাসিক সত্য অথবা বৈজ্ঞানিক বা অতিজাগতিক সত্তার ধারণা বা দার্শনিক সত্য বুঝাচ্ছে না ; কারণ সাহিত্যের ভাল মন্দ হওয়ার পক্ষে এগুলি অপরিহার্য নয়, সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞান বা পরাবিদ্যার বিকল্প কোন বিদ্যা নয়। এ কথা স্বীকার করে নিয়েও অনেক তত্ত্ববিদ ও সমালোচক এমন ধারণা পোষণ করে আসছেন যে সাহিত্য ঘটনার যথাযথ বর্ণনা হিসাবে সত্য নয় বটে, কিন্তু সাহিত্যিককে ঔচিত্য রক্ষা করতেই হবে, যা ঘটেছে তার বর্ণনা সাহিত্যিক না করতে পারেন, কিন্তু যা ঘটলেও ঘটতে পারতো, এরিষ্টটলের ভাষায় What might have happened—ঘটনাকে এমনটি হওয়া চাইই

চাই। অনেকে একথা স্বীকার করতে চান না, তাঁরা বলেন, আমরা যখন কোন সাহিত্য পড়ি তখন আমরা সম্ভব অসম্ভবের উচিত-অনুচিতের ধারণা দূরে সরিয়ে রাখি এবং লেখক যাকে উচিত বলে মনে করাতে চান, তাকেই উচিত বলে মনে করি—ইচ্ছা করে অবিশ্বাসকে স্থাপিত রাখি (Voluntry suspension of disbelief) এবং তা করি বলেই শিল্পের রস আস্বাদন করতে পারি। সুতরাং The only criterion of plausibiliy which you can apply is the criterion of internal consistency—আভ্যন্তরিক সঙ্গতির ঔচিত্য ছাড়া আর কোন ঔচিত্যই প্রযোজ্য হতে পারে না।

এ সম্পর্কে আর কোন কথা বলার আগে—সত্য সম্বন্ধে যে দুটি ধারণা আছে, সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা আপনাদের সামনে রাখতে চাই। প্রথমতঃ তাকেই আমরা সত্য ব'লে থাকি যা'র সঙ্গে বাস্তব সত্তার বা ঘটনার মিল আছে "Conformity with the actual আছে। একে বলে Correspondence theory of truth দ্বিতীয়তঃ তাকেও আমরা সত্য বলি যখন ধারণাটির মধ্যে আভ্যন্তরিক সঙ্গতি থাকে—Internal consistency থাকে। একে বলে Coherence theory of truth। সাহিত্যশিল্পের সত্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্য—তা' না হ'লে "ইতিহাসের চেয়ে বড় উপন্যাস আর কিছুই—হ'তে পারতো না, সংবাদচিত্রই সর্বোৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র হত, বিজ্ঞানের বই অথবা তদন্তের শ্বেতপত্রগুলি প্রার্থীর সেরা সাহিত্য হয়ে উঠতো।" মোট কথা শিল্পের বা সাহিত্যের সত্য যে Correspondence-এর মধ্যে নিহিত নেই, আভ্যন্তরিক সঙ্গতির মধ্যেই নিহিত এ কথা প্রায় সকলেরই কথা। এই সংস্কার নিয়েই মিঃ ই, এম্‌, ফোরস্টার, তাঁর 'এ্যাসপেক্টস অফ দি নভেল' গ্রন্থে ফিলডিঙের 'এমেলিয়া' এবং জেন অস্টেনের এম্মা চরিত্রের বাস্তবতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন—They are real not because they are like ourselves... but because they are convincing অর্থাৎ তারা এ জন্য বাস্তব নয় যে তারা আমাদেরই মতো বাস্তব, এই জন্য বাস্তব যে তাদের আমরা বাস্তব বলে

অঙ্গীকার না করে পারিনে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা অনেকেরই মনে পড়বে—তিনি বলছেন যে ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে গেলে চলবে কেন? সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যে বস্তু চাই, সেই বস্তুর অস্তিত্বের পরিমাণ হিসাব করে আমরা তার বাস্তবতা-অবাস্তবতা নির্ধারণ করব। সাহিত্যের কাছে যেহেতু আমরা চাই রসবস্তু, রসের মাত্রা দিয়েই সাহিত্যের বাস্তবতা বিচার করতে হবে। রসের বাস্তবতাই সাহিত্যের বাস্তবতা। সাহিত্য বস্তুসত্যকে প্রকাশ করে না, ব্যক্ত করে রস-সত্যকে। কিন্তু যতই আভ্যন্তরিক সঙ্গতিকে বা অনস্বীকার্য রূপকে বা রসসত্যকে আমরা সাহিত্যিক সত্য ব'লে ঘোষণা করিনে কেন, জীবন সত্যের মানব প্রকৃতিগত সত্যের দাবীটি একেবারে নস্যাৎ হয়ে যায়নি। এদের পক্ষে যুক্তি দিতে বলা হ'য়েছে—সাহিত্যকে সত্য হতে গেলে প্রকৃতির সঙ্গে হুবহুভাবে মিলতেই হবে এমন কোন কথা নেই বটে, কিন্তু এ কথা মিথ্যা নয় যে, কল্পনা-উৎকল্পনার শত পক্ষবিস্তার সত্ত্বেও শত আপাত অসাদৃশ্য সত্ত্বেও সাহিত্যের অন্তরতম প্রদেশে সত্যের কোন-না-কোন একটা দিক—বিরাজ করবেই। সাহিত্য ডাঃ জনসনের ভাষায় ব'লতে গেলে "General and transcendental truths"—কে নিদর্শায়িত করে। সাহিত্য যে সত্যের প্রকাশ—অবশ্য সাকার মূর্তিতে প্রকাশ—এ কথা বহু আগেই, প্লেটো-এরিষ্টটলের বিশেষতঃ এরিষ্টটলের লেখায় পাওয়া গেছে। Poetry যেহেতু imitates the universal through particular—poetry is more philosophical than history এ কথা ব'লে এরিষ্টটল সাহিত্য-শিল্পের দার্শনিক প্রকৃতির দিকে অনেক আগেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নাট্য-সাহিত্য যে তৎসদৃশের নয় তজ্জাতীয়ের উপস্থাপনা এবং তজ্জাতীয়ের উপস্থাপনা বলে বস্তু বৈশিষ্ট্যের বা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের উপস্থাপনা বিশেষের সম্ভাব্য বা আদর্শ রূপের উপস্থাপনা তথা প্রকৃতিরই উপস্থাপনা এবং প্রকৃতির উপস্থাপনা ব'লে পরোক্ষভাবে জৈবিক মানসিক ও সামাজিক সত্যের উপস্থাপনা—এ কথাটি এরিষ্টটলের এবং আমাদের অভিনবগুপ্তের ধারণা থেকে নিষ্কাশিত করে নেওয়া খুবই সহজসাধ্য কাজ।

শিল্পের উদ্দেশ্য 'টাইপ' সৃষ্টি করা বা Art is characteristic এ কথা বলা যত অর্বাচীনতার নিদর্শনই হো'ক না কেন, শিল্প সমালোচনায় এ সংস্কার মরেও মরছে না। শিল্পের সঙ্গে বিশেষতঃ সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের জৈবিক প্রকৃতির মানস প্রকৃতির এবং সমাজ প্রকৃতির নিগূঢ় যোগ থাকে, বাস্তবের কোন-না-কোন দিকের বা সত্যের সম্বন্ধ থাকে ব'লেই আমরা আপাত অবাস্তব সৃষ্টির মধ্যেও প্রকৃতির চাহিদা মেটাতে পেরে আনন্দিত হই—কোন সাহিত্য প্রধানতঃ জৈবিক প্রকৃতিকে, কোন সাহিত্য প্রধানতঃ মানস-সত্যকে, কোন সাহিত্য প্রধানতঃ সমাজনৈতিক সত্যকে প্রকাশ করে শেষ পর্যন্ত বাস্তবকেই ব্যক্ত করে —এ ধারণার পক্ষে প্রবল সমর্থন রয়েছে। সাহিত্যে কোন না-কোন ভাবে সত্যই প্রকাশিত হয়—এ ধারণা পুরাতন ও বহুপোষিত। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর "লিরিক্যাল ব্যালাড্‌সে"র ভূমিকায় অকপটেই স্বীকার করেছেন—কাব্যের উদ্দেশ্য—Truth not individual and local, but general and operative উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। এ সম্বন্ধে হ্যারোল্ড ওসবোর্ণ মহাশয় যে মন্তব্য করেছেন তা' উদ্ধৃত করলেই অবস্থাটি বুঝতে পারা যাবে। "But to whatever view they incline in theory the majority of critics continue in practice to praise certain works of literature because they seem profoundly true to human heart or a wise understanding of man's life and destiny and it seems likely that whatever the theorist may say, they will continue to do so" (৯৭ পৃষ্ঠায়)। আমরা দেখতে পাই কলাকৈবল্যবাদের অন্যতম প্রবর্তক উইলিয়াম পেটার পর্যন্ত সাহিত্য বিচারে দু'রকম মানদণ্ড স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শৈল্পিক মূল্যের বিচার মুখ্যতঃ রূপের বিচার এ কথা ঘোষণা করে তাকে বলতে হয়েছে—The distinction between great art and good art depends immediately as regards literature at all events, not on its forms but on the matter" উক্তিটির তাৎপর্য এই যে শিল্পের মহত্ব একটি স্বতন্ত্র গুণ এবং তা'

রূপনির্ভর নয়, বিষয়গৌরব-নির্ভর। "It is in the quality of the matter it informs or controls, its compass, its variety its alliance to great ends or the depth of the note of revolt or the largeness of the hope in it that the greatness of the literary art depends, as the divine comedy Paradise Lost, Les Miserables, The English Bible are great art." অর্থাৎ বিষয়বস্তুর গুণের মধ্যে, তার ব্যাপ্তির মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, মহান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযোগের মধ্যে, বিদ্রোহের সুরের গভীরতার মধ্যে, উদ্দীপিত আশার উদারতার মধ্যে, সাহিত্যের মহত্ব নিহিত থাকে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—'সত্যকে' বাদ দিয়ে মহান সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না, এ বিষয়ে অনেকেই একমত এবং একমত বলেই সাহিত্য বিচারে—সৌন্দর্যমূল্য এবং মহত্ত্ব-মূল্য এই দু'টি মূল্যমান প্রয়োগের পক্ষপাতী। কিন্তু যখনই আমরা রূপকে নিঃসঙ্গ রূপে না দেখে বিষয়েরই অভিব্যক্তি রূপে দেখি, তখনই সৌন্দর্যের বা রূপ-মূল্যের নিরপেক্ষতা অস্বীকার করতে বাধ্য হই এবং এই স্বীকৃতিতেই ফিরে আসি যে রূপ বিষয়কে ব্যক্ত করেই সার্থক হয়—বিষয় যত রূপের মধ্যে অঙ্গলাভ করে তত রূপের উৎকর্ষ, যত বিষয়ের অভিব্যক্তি বাধা পায় তত রূপের অপকর্ষ।

এইবার, 'Realistic theory of art'—গ্রহণের পথে সব চেয়ে বড় বাধা যেগুলি সেগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আজকের ভাষণ শেষ করব। সংগীত, স্থাপত্য এবং অলংকৃত বিমূর্ত চিত্র ও ভাস্কর্য—যেগুলি নিজেদের ছাড়া আর কোন কিছুকেই উপস্থাপিত করে না অথচ যেগুলি শিল্প নামেই পরিচিত, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের পথে বড় অন্তরায়। আবার যেগুলি কোন কিছুকে উপস্থাপিত বা বর্ণনা করছে, অথচ শিল্পের মর্যাদা পাচ্ছে না যেমন বিজ্ঞাপনী ছবি, শ্বেতপত্র প্রভৃতি, সেগুলিও বাধা। প্রথম ক্ষেত্রে বাস্তবতা অব্যাপ্ত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতিব্যাপ্ত। আমরা জানি শিল্পতত্ত্বে অনুকৃতিবাদ প্রধানতঃ চিত্র ও ভাস্কর্যকে লক্ষ্য করেই দেখা দিয়েছিল এবং সাহিত্যকেও জীবনের অনুকরণ মনে করতে খুব মাথা ঘামাতে হয়নি, কিন্তু স্থাপত্য ও সংগীতকে অনুকরণ ব'লে প্রমাণ করা

বেশ একটু কষ্টসাধ্য নয় কি? প্রথমতঃ সংগীতের কথাই ধরা যাক। যে শব্দ থেকে সংগীত তৈরি হয় তাদের প্রাকৃতিক ধ্বনি বলা যায় না, তারা তৈরি ক'রে-নেওয়া ধ্বনি। অবশ্য প্রাকৃতিক ধ্বনি সংগীতে কিছু কিছু মেশানো না হয় এমন নয় কিন্তু সংগীত সমালোচকরা ঐ সব ধ্বানিক মিশ্রণকে দোষাবহ বলে মনে করেন। তারপর প্রশ্ন—স্বরগুলি বিন্যস্ত হ'য়ে যে রাগ-রাগিনী গড়ে উঠে, প্রকৃতিতে তার সদৃশ সমাবেশ কোথায়? এর উত্তরে অনুকরণবাদীরা ও সংকেতবাদীরা নিশ্চয়ই বলবেন—বলে থাকেনও—Music is a natural language of emotions, representing by natural symbols of sound that affective element in human experience which is ineffable by the conventional symbolism of spoken language (১০৩ পৃঃ এঃ এ্যাঃ ক্রিঃ) সংগীত আবেগের অনুকরণ এ মত প্লেটো-এরিষ্টটলের সময় থেকে চলে আসছে এবং এই মতের বক্তব্য এই যে সংগীত কোন বস্তু-সত্তাকে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ধ্বনি-তরঙ্গকে বা ধ্বনিপরম্পরাকে বস্তুতঃ অনুকরণ করে না, সংগীত ধ্বনি সংকেতে ভাবাবেশ-সত্তাকে আভাসে বা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করে থাকে। আমরা পরে দেখতে পাব—কল্পনাবাদীরা এই মতকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে এবং সংগীতকে আবেগনিরপেক্ষ সমন্বিত ধ্বনি-ক্ষেত্রবিশেষে পরিণত করতে চেষ্টা করেছে। অনুকরণবাদের প্রবলতম প্রতিবাদ যদি কিছু থাকে সে হ'চ্ছে স্থাপত্য। স্থাপত্যে অনুকৃতির মূল ধর্মটিই অনুপস্থিত অর্থাৎ অনুকৃতি ও অনুকার্যের মধ্যে উপাদানগত কোন পার্থক্য নেই। অনুকার্য বিষয়ের উপাদানই অনুকরণের মাধ্যম। কোন একটি মন্দির বা প্রাসাদ কোন মন্দিরের বা প্রাসাদের অনুকরণ নয়, তারা প্রাকৃত পদার্থ ই। এই কারণে অনেকে স্থাপত্যকে চারুকলার কৌলিন্য দিতে চাননি।

অবশ্য গোঁড়া বাস্তববাদীরা বলতে পারেন—স্থপতি তৎসদৃশ কোন প্রাসাদকে বা মন্দিরকে অনুকরণ করেন না বটে কিন্তু তজ্জাতীয় কোন কিছুকে অনুকরণ না করে পারেন না। মন্দির নির্মাণে বা প্রাসাদ নির্মাণে যত অলংকারই তিনি

প্রয়োগ করুন, যত আকৃতিক সুষমা সৃষ্টিরই চেষ্টা করুন, মন্দির জাতীয় বা প্রাসাদ জাতীয় কোন একটি গৃহায়তন তাঁকে নির্মাণ করতেই হবে, যা না করলে কেউই তাঁকে স্থপতি বলবে না। স্থপতি প্রাকৃতিক বস্তু অনুকরণ করেন না, ঠিক, কিন্তু মানুষের তৈরী বস্তুর আদর্শে প্রাকৃতিককল্প বস্তু নির্মাণ করেন এ কথা তো মানতেই হবে। অবশ্য শিল্পকে যারা আকারগত সমমাত্রিকতায় বা সামঞ্জস্যের এক কথায় সৌন্দর্যের প্রতিমায় পরিণত করতে চাইবেন, তারা কিছুতেই অনুকরণবাদীদের বিষয়সাপেক্ষতা মানবেন না।

পরবর্তী বক্তৃতায় তাঁদের কথাই বলা হবে।

শিল্পতত্ত্বে আবেগবাদী ও আনন্দবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

শিল্পের সঙ্গে আবেগের ও আনন্দের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে—এই ধারণাটি শিল্পতত্বচিন্তার উন্মেষকাল থেকেই চলে আসছে। শিল্পের জগৎ মানুষের আবেগানুভূতির অভিব্যক্তি, শিল্পের জগৎ মানবাত্মার আনন্দময় কোষ থেকে উৎপন্ন হয় এবং মানুষের আনন্দময় সত্তাকে তৃপ্ত করে অনুকরণবাদেরই মতো ভাবুকদের মনে এ ধারণাটি বাসা বেঁধে আছে। শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণে এই সব সংস্কার কতখানি প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে, "এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা"র (১১শ সংস্করণ) চারুশিল্পের সংজ্ঞাটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারা যায়। আনন্দের উপরে ঝোঁক দিয়ে যে সংজ্ঞাটি করা হয়েছে প্রথমে সেইটি উদ্ধৃত করা যাক। সংজ্ঞাটি এই—The fine arts are those among the arts of man which spring from his impulse to do or make certain things in certain ways for the sake of a special kind of pleasure independent of direct utility, which it gives him so to do or make them and next for the sake of the kindred pleasure which he derives from witnessing or contemplating them when they are done or made by others.

বাংলায় অনুবাদ করলে এরূপ দাঁড়াবে—চারুকলা হ'চ্ছে মানুষের সেই সব শিল্পকর্ম যেগুলি মানুষের বিশেষ রীতিতে বিশেষ কয়েকটি বস্তু তৈরি করার প্রবৃত্তি থেকে উৎপন্ন হয় এবং যাদের মানুষ তৈরি করে প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ উপযোগসম্পর্কবিহীন বিশেষ ধরনের আনন্দ সৃষ্টি করার জন্য, দ্বিতীয়তঃ অপরে যখন ঐ জাতীয় বস্তু নির্মাণ করে তা' দেখে বা ধ্যান করে সমজাতীয় আনন্দ পাওয়ার জন্য। এই সংজ্ঞাটির 'বিশেষ ধরনের আনন্দ' কথাটি লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ শিল্প যে আনন্দ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে প্রয়োজনের কোন

যোগ থাকে না, এবং তা থাকে না বলেই শিল্পের আনন্দ সাধারণ আনন্দময়, ব্যক্তিগত জৈবিক বাসনাকামনা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দ নয়, বিশেষজাতীয় আনন্দ, এক কথায় শৈল্পিক আনন্দ, শিল্পসম্ভোগজনিত আনন্দ। এই সংজ্ঞাটির তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে এই যে শিল্প হ'চ্ছে সেই বস্তু যা শিল্পসৃষ্টির আবেগ থেকে সৃষ্ট হয় এবং যা' শৈল্পিক আনন্দ সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে আর কিছু বলার আগে, আবেগের দিকে দৃষ্টি রেখে যে সংজ্ঞাটি করা হয়েছে সেটি উদ্ধৃত করছি। বলা হ'য়েছে—Fine art is everything which man does or make in one way rather than another freely and with premeditation in order to express emotion . . and with results independent of direct utility and capable of affording to many permanent and disinterested pleasure" অর্থাৎ চারুকলা ব'লতে সেইসব বস্তুকেই বুঝায় যা মানুষ করে বা নির্মাণ করে, একটি বিশেষ রীতিতে, স্বাধীনভাবে এবং পূর্বপরিকল্পনানুসারে এবং করে আবেগকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই, এবং তার ফলশ্রুতি এই যে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক থাকেনা এবং তা' বহু ব্যক্তিকে স্থায়ী ও 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' দিতে সক্ষম। এখানেও উপযোগসম্পর্কহীন আনন্দের কথা আছে বটে কিন্তু এখানে আবেগের প্রকাশকেই মুখ্য ব্যাপার বলে গণ্য করা হ'য়েছে—প্রথমটিতে যেমন আনন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল, আশা করি, তা' সকলেরই কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সকলেই এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে শিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে পণ্ডিতরা কখনও জৈবিক বাসনাপরিপূরণসম্পর্কহীন আনন্দের কোটিতে, কখনও আবেগের কোটিতে আশ্রয় নিয়েছেন। আগেই বলেছি এই শ্রেণীর আনন্দবাদীদের কাছে চারুশিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ হচ্ছে—ব্যক্তিগত বাসনা কামনার পরিপূরণজনিত সাধারণ আনন্দ থেকে পৃথক একপ্রকার বিশেষ আনন্দ এবং আবেগবাদীদের কাছে চারুশিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ—

আবেগমূলকতা বা আবেগজনকতা বা আবেগবিষয়কতা। আবেগমূলক প্রকাশ বলতে বুঝায়, সেই প্রকাশ যা' আবেগের প্রেরণা থেকে উদ্ভূত হয়, আবেগজনক প্রকাশ বলতে বুঝায়, সেই প্রকাশ যা' শিল্পোপভোক্তার মধ্যে আবেগ উদ্রিক্ত করে। আবেগ বিষয়ক প্রকাশ বলতে বুঝায় সেই প্রকাশ যার বিষয়বস্তু হ'চ্ছে আবেগ।

প্রথমতঃ, শিল্পে অনুভব বা আবেগ অভিব্যক্ত হয় এই মতটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। শিল্পসৃষ্টি আবেগমূলক ও আবেগবিষয়ক ব্যাপার এবং শিল্পের ফলশ্রুতি আনন্দসম্ভোগ—এই ধারণা কি করে জন্মালো তার ইতিহাস খুঁজতে বের হ'লে আমাদের আদিম সমাজে গিয়ে পৌছতে হবে এবং দেখতে হবে কিভাবে শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে আবেগের ও আনন্দের যোগ স্থাপিত হয়েছে। আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং আদিম সমাজের মানুষের মনের গঠন প্রকৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। সকলেই এ কথাটা বেশীকম জানেন এবং মেনেও থাকেন যে, আদিম মানুষের মনের মননক্ষমতা খুবই কম ছিল এবং মননক্ষমতা যত কম ছিল তত বেশী ছিল আবেগপ্রবণতা অর্থাৎ আচরণে আবেগের প্রাধান্য। মন যত মাত্রায় ছিল প্রাক-নৈয়ায়িক (প্রি-লজিকাল) স্তরে,, ব্যক্তি-চেতনা সেই অনুপাতে ছিল কম, তত ছিল সামষ্টিক চেতনার প্রাবল্য। সামষ্টিক আচরণের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক-ভাবেই আবেগাত্মক বা আবেগপ্রধান হ'ত। আদিম মানুষের দলবদ্ধ নৃত-গীতে আবেগাত্মক ঘটনাকেই, গোষ্ঠীর আনন্দ-বেদনাকেই উপস্থাপিত করা হত ব'লে উপস্থাপনা মুহূর্তে অনুকারী শিল্পীদের মধ্যে একটা আবেগোদ্দীপনাময় মানসিক অবস্থা দেখা দিত এবং যাঁরা ঐ সব নৃত্যগীতাদি উপভোগ করতে সমবেত হ'তেন তাঁদের মধ্যেও ঐরূপ আবেগোদ্দীপনা সঞ্চারিত হ'ত। এইভাবে সমগ্র গোষ্ঠীর মন আবেগে ও আনন্দে আন্দোলিত হ'ত। শিল্পসৃষ্টির ও সম্ভোগের মুহূর্তে মনের ঐ অসাধারণ অবস্থাটি দেখে দেখে, ক্রমে এই ধারণাটি গড়ে উঠতে থাকে—শিল্প মানুষের আবেগের অভিব্যক্তি, শিল্পে মানুষ ব্যক্তিগত

বা সমষ্টিগত আবেগকে কখনও উত্তমপুরুষকে কখনও বা প্রথমপুরুষকে আলম্বন ক'রে প্রকাশ করে এবং প্রকাশ করার ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আত্মপ্রকাশের আনন্দ লাভ করে। মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, শিল্পসৃষ্টি যে আবেগমূলক ও আবেগ বিষয়ক ব্যাপার এবং শিল্পের জগৎ যে শেষ পর্যন্ত আনন্দময় এই সংস্কার শিল্পতত্ত্বচিন্তার প্রথমযুগ থেকেই চলে আসছে।

এবার শিল্পতত্ত্বে আবেগবাদ ও আনন্দবাদের বলতে নির্দিষ্টভাবে কি বুঝায় এবং অবেগানুভূতিকে ও আনন্দকে শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ ব'লে গ্রহণ করা চলে কি না এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ আবেগবাদ বা অনুভববাদ নিযে আলোচনা করা যাক এবং তার পক্ষে ও বিপক্ষে কি বলার আছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক। শিল্পতত্ত্বে আবেগবাদকে আমি তিন শ্রেণীতে ভাগ করে দেখাতে চাই। প্রথম শ্রেণীতে রাখছি সেই মতবাদটিকে যার বক্তব্য হচ্ছে—শিল্প যে বৃত্তি থেকে জন্ম নেয়, তা জ্ঞানাত্মিকা কোন বৃত্তি নয়—তা বুদ্ধি বৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ অনুভববৃত্তির সৃষ্টি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখছি সেই বহুপ্রচলিত মতবাদটি যার বক্তব্য হল—শিল্প প্রকাশাত্মিকা ক্রিয়ার বা বৃত্তির সৃষ্টি বটে, কিন্তু শিল্পের বৈশিষ্ট্য তার বিষয়বস্তুর মধ্যে নিহিত এবং সেই বিষয়বস্তু হল 'ভাবাবেগ' এবং তৃতীয় শ্রেণীতে রাখছি সেই মতবাদটি যার বক্তব্য হল—শিল্পের উদ্দেশ্য ভাবাবেগ জাগানো বটে কিন্তু ঐ ভাবাবেগ সাধারণ ভাবাবেগ নয়, ঐ আবেগ সাধারণ ভাবাবেগ থেকে স্বতন্ত্র এক আবেগ এবং তাকে বলা হয় "শৈল্পিক আবেগ" (এস্থেটিক ইমোশান)।

প্রথমতঃ শিল্প অনুভব বৃত্তির সৃষ্টি—এই মতবাদটি বিচার করে দেখা যাক। এ কথা সকলেরই জানা যে, মানুষের এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি অনেকাংশে এক, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হয়, তবে মানুষ পশু থেকে পৃথক হ'য়েছে—তার উর্ধতন মস্তিষ্কের জটিল গঠনের এবং তজ্জনিত প্রকাশ ক্ষমতার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যের জন্ত। এই বৈশিষ্টই মানুষকে

বাগ্‌ভাষার অধিকার দিয়েছে, তার জ্ঞানবৃত্তির তথা প্রকাশশক্তির মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এখন, যে কথাটা না বলতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সে এই যে, নিছক অনুভব বা আবেগ যদি শিল্পসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট বলে গণ্য হয়, তা' হ'লে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, যে পশুরাও শিল্পসৃষ্টি করতে সমান সক্ষম, শিল্পসৃষ্টি করার ব্যাপারে পশুরা মানুষের চেয়ে একটুও বাধাগ্রস্ত নয়। কিন্তু পশুরা যে শিল্পের জগৎ গড়ে তুলতে পারেনি এ কথা বলাই বাহুল্য এবং তা'তে এই কথাই প্রমাণিত যে অনুভববৃত্তি বা আবেগবৃত্তি এককভাবে কোন শিল্প সৃষ্টি করতে পারে না, এবং শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে মানুষের উন্নততর প্রকাশক্ষমতার অর্থাৎ উন্নততর জ্ঞান ও কর্মশক্তির গুণেই। এই ক্ষমতাই ইংরেজিতে 'ইমিটেশান' 'রিপ্রেজেণ্টেশান,' 'এক্সপ্রেশান', কম্যুনিকেশান, কল্পনা প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়ে থাকে এবং আমাদের শিল্পশাস্ত্রে অনুকরণ, রচনা কল্পনা নির্মাণ বা নির্মিতি, উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা প্রভৃতি নামে প্রচলিত কিন্তু এখানেই আর এক প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে শিল্পকে প্রকাশবৃত্তির ব্যাপার বলে স্বীকার করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় কি? প্রকাশ নামক সৃজনী বৃত্তিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে সব কথা আমাদের জানা আছে কি? প্রকাশ কি নিছক জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি? অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রকাশ কি সমার্থক? অথবা প্রকাশ জ্ঞান-অনুভব-কর্মমিশ্রিত একটি যৌগিক মানসিক ব্যাপার? অথবা প্রকাশ নামক সৃজনী বৃত্তিটি আপাত দৃষ্টিতে জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি ব'লে মনে হ'লেও, মূলতঃ অনুভব-ক্রিয়া বিশেষ, আবেগচালিত রূপ পরিকল্পনা? বলা বাহুল্য, যাঁরা জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া ব'লতে একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞান বুঝেন ইংরেজিতে যাকে Reasoning, Understanding intellection বলে সেই ব্যাপারটুকুই বুঝেন এবং এই ক্রিয়ার গণ্ডীর বাইরে জ্ঞানাতিরিক্ত অন্তর্বিধ ক্রিয়ার রাজ্য—অনুভববৃত্তির রাজ্য—দেখতে পান তাদের কাছে সৃজনী বৃত্তিটির স্বরূপ খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি। দৃষ্টান্ত

দিয়ে কথাটা বুঝানো যাক। আমরা দেখতে পাই, প্লেটো শিল্পকে অনুকৃতি-করণ ব'লে ঘোষণা করলেও, অনুকরণ-বৃত্তিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেননি, অনুকরণ জ্ঞান ব্যাপার কি না অথবা জ্ঞানের ও কর্মের মিশ্র ক্রিয়া কি না এ প্রশ্নের উত্থাপন ও সমাধান করতে চেষ্টা করেন নি, বরং 'আয়ন' নামক সংলাপে, তিনি শিল্প সৃষ্টি-ব্যাপারটিকে দৈবাবেশের তথা উন্মাদনার ও আবেগের ব্যাপার বলে প্রচার করেছেন এবং এমন কথাও বলেছেন যে বুদ্ধির বিচারশক্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকতে উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। এখন, অনুকরণ যেহেতু বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত কোন ব্যাপার নয় এবং বুদ্ধির বাইরে যা সব irrational প্লেটোর মতে অনুকরণ বৃত্তিটি—আমাদের ভিতরকার সেই উপাদানেরই সহচারী যে উপাদানটি অন্তর্দৃষ্টি (insight) থেকে সম্পূর্ণ দূরবর্তী এবং দূরবর্তী বলেই ঐ উপাদানটি অতিনিঃস্ব (beggarly)। প্লেটোর সিদ্ধান্ত—Then imitation is a beggar wedded to a beggar and producing beggarly children।" অনুকরণ একটি ভিক্ষুক, কারণ সে বুদ্ধিবৃত্তি নয় "rational'' নয়, ভিক্ষুকেরই সঙ্গে তার পরিণয়, কারণ imitation stops at natural things" প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের মধ্যে সে আবদ্ধ—বিশেষের জগতের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ভিক্ষুকের সন্তানের জনক, কারণ "ঐন্দ্রিয় সুখ" (sensual pleasure) ছাড়া আর কোন উচ্চাঙ্গের আনন্দ দিতে পারে না। এই কথা বলার জন্ম প্লেটোকে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে বেনিদেত্তো ক্রোচে একজন এবং প্রধান একজন। প্লেটোকে সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন—প্লেটোর আসল গলদই এই যে তিনি বৌদ্ধিক জ্ঞানের বা সত্যের বাইরে অন্য কোন রকম জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি এবং ঐ জ্ঞানের এলেকার বাইরে কেবল 'sensuality and passionality,—ইন্দ্রিপরতন্ত্রতা ও আবেগ পরায়ণতাই দেখতে পেয়েছেন। এখানেই একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। অনুকরণ প্রত্যক্ষের জগতের মধ্যে—প্রতীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ,

এ কথা বললে (প্লেটো সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস নামক গ্রন্থের—'প্লেটোতে জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ' পরিচ্ছেদে প্লেটো যে যে যুক্তিতে প্রত্যক্ষপ্রতীতিকে জ্ঞান বলে স্বীকার করেন'নি তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় আমি প্রবেশ করতে চাইনে, আমি শুধু এদিকেই—আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে—) অনুকরণকে অনুভবমূলক ব্যাপার মনে করা হয় না ; মনে করা হয় একটি বিশেষ জ্ঞান ক্রিয়া ব'লেই, যে জ্ঞানক্রিয়া বৌদ্ধিক জ্ঞান (Conception) নয়. ঐন্দ্রিয় প্রতীতি (perception) কিন্তু প্রত্যক্ষকরণকে আবেগমূলক ব্যাপার ব'লে মনে না করলে, অনুকরণকে 'passionality' বলা ঠিক হবে কিনা নিশ্চয়ই ভেবে দেখা দরকার। অনুভব ব'লতে আমরা বুঝি বেদনা—সুখ বোধ, দুঃখ বোধ এবং আবেগ বলতে বুঝি কোন সহজ বা উপজাত বাসনা-বন্ধের উত্তেজনাজনিত একটি পরিবর্তিত দৈহিক অবস্থা। প্লেটো যখন বলেন—বুদ্ধির লেশমাত্র থাকতে শিল্পের জন্ম সম্ভব হয় না, তখন নিশ্চয়ই এ কথা বলেন না যে শিল্প অনুভব বা আবেগরূপ মানসিক ক্রিয়ার সৃষ্টি, শুধু এই কথাই বলতে চান যে শিল্প বুদ্ধিবৃত্তির সৃষ্টি নয় এব নয় ব'লেই শিল্পের জন্মভূমি হ'ল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের জগৎ—এবং সেই জগতের সঙ্গে নিম্নতর মানসিক ক্রিয়ার সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সম্পর্ক তত দূরবর্তী। এই ধারণা থেকেই উপসিদ্ধান্ত হিসাবে যে ধারণাটি প্রসারিত হয়েছে সে এই যে, শিল্পের জন্ম আবেগ থেকে—মনের এমন একটি স্তর থেকে যে স্তরকে নিছক বুদ্ধির বা নিছক প্রত্যক্ষকরণের বা নিছক আবেগানুভূতির স্তর বলা চলে না, যে স্তরে বোধ ও আবেগ অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত হ'য়ে আছে। যে স্তরে ঐন্দ্রিয় প্রতীতি ও অনুভূতি ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। প্লেটোর শিষ্য এরিষ্টটল অনুকরণ বৃত্তিটিকে জ্ঞানাত্মিকা বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শিল্পসৃষ্টিতে যেমন দেব প্রেরণার আবেশ ও উদ্দীপনার প্রভাব একেবারে অস্বীকার করেন নি, তেমনি অনুকরণকে জ্ঞান-কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার এক মিশ্র ব্যাপার ব'লেই গ্রহণ করেছিলেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, শিল্পসৃজনের বৃত্তিটির স্বরূপ সম্বন্ধে

সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রাচীন গ্রীক-রোমান যুগে কেন, বিংশশতাব্দীতেও অবিসংবাদিত রূপে গড়ে উঠতে পারেনি। এ কথা শুনে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, 'শিল্প কল্পনা বৃত্তির সৃষ্টি এ কথা তো অনেকেরই মুখে শোনা গেছে, তবে কেন বলা হ'ল সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে উঠেনি ? উত্তরে অতি সংক্ষেপে বলে রাখছি—কল্পনাবৃত্তির নাম অনেকেরই মুখে শোনা গেছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এ কথাটিও যে কল্পনার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা অত্যন্ত ঘোলাটে ছিল, অনেকেই শেষ পর্যন্ত কল্পনাকে আবেগমূলক ব্যাপার ব'লে মনে করতেন। বেনিদেত্তো ক্রোচে তার এস্থেটিক গ্রন্থের "শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস" খণ্ডে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন যে সৃজনশীল কল্পনার বা প্রতিভান-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তথাকথিত কল্পনা-বাদীদের চিন্তার পা কখনও বুদ্ধিবাদিতার কখনও বা আবেগবাদিতার ভুলের গর্তে পড়েছে, কেউ কল্পনাকে বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত, কেউ বা আবেগমূলক ব্যাপার ব'লে মনে করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত শিল্পদার্শনিক জামবাত্তিস্তা ভিকো, আলেক-জাণ্ডার বোমগার্টেন, এমন কি মহামতি ইমানুয়েল কাণ্টও, ক্রোচে মনে করেন, এই ভুলের আবর্তে ঘুরপাক খেয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পচিন্তা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্রোচে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—"এই যুগের লেখায় কল্পনাকে বাক্‌কেলির সঙ্গে, বাক্‌কেলিকে রুচির সঙ্গে, রুচিকে অনুভবের সঙ্গে এবং অনুভবকে প্রাথমিক প্রতীতি বা কল্পনার সঙ্গে সমীকৃত করা হ'য়েছে।" ফ্রান্সের দুবো খুব জোরের সঙ্গে অনুভববৃত্তির পক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন—"অনুভবই একমাত্র বৃত্তি যা' ষষ্ঠেন্দ্রিয় কল্পনার রূপ ধরে শিল্পসৃষ্টি করে থাকে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে কল্পনাকে অনুভবমূলক ব্যাপার বলে মনে করা হচ্ছে, অনুভবের সঙ্গে কল্পনার নিগূঢ় যোগ রয়েছে, এমন একটা ধারণা মনের তলদেশে র'য়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে কাণ্টের শিল্পতত্ত্বচিন্তা সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করলে বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কান্ট তাঁর 'ক্রিটিক অফ জাজমেন্ট' গ্রন্থের ভূমিকায় 'মানসিক বৃত্তি' ও তাদের জ্ঞানরূপের যে তালিকাটি দিয়েছেন প্রথমেই আমি সেটি আপনাদের চোখের সামনে

রাখতে চাই। কাণ্টের মত তিনটি মানসিক বৃত্তির জ্ঞানাত্মক রূপও যথাক্রমে তিনটি।

মানসিক বৃত্তির তালিকা —জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তিসমূহ

১। জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি —বুদ্ধি (understanding)

(cognitive faculties)

২। আনন্দ বেদনার অনুভব—অবধারণ (judgment)

(Feeling of pleasure & displeasure)

৩। বাসনা-বৃত্তি —বিবেচনা (reason)

(faculty of desire)

কাণ্টের বক্তব্য বোধ হয় এই যে জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তিই মানুষের মধ্যে পরিণত বুদ্ধির রূপ ধরেছে, অনুভববৃত্তি জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উন্নীত হয়ে 'অবধারণ' বা 'বিচারের রূপ নিয়েছে এবং বাসনা-বৃত্তির ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রবুক্ত হয়ে 'বিবেচনা' নাম নিয়েছে। লক্ষ্য করবার—কাণ্টের কাছে—understanding, judgment এবং 'reason' তিনটিই—Cognitive faculties'র অন্তর্গত। মনে রাখা দরকার যে 'জাজমেণ্ট' (অবধারণ) এবং 'রিজিন' তাত্ত্বিক জ্ঞান (থিয়োরেটিকাল কগনিশান) ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে রাখতে বলছি এই কারণে যে কাণ্ট 'আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং' ছাড়া অন্য কোন প্রকার জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না—এই বলে যাঁরা কাণ্টের সমালোচনা করেছেন তাঁরা সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেননি। দেখা যাক, কাণ্ট যখন শিল্পকে প্রতিভার সৃষ্টি বলেছেন তখন কী বুঝাতে চেয়েছেন। কাণ্টের কাছে প্রতিভা হচ্ছে সেই সঞ্জীবনী শক্তি (animating principle) যা 'এস্থেটিক আইডিয়া' তৈরি করে এবং "এস্থেটিক আইডিয়া' হচ্ছে "That representation of the imagination which induces much thought, yet without possibility of any definite thought whatever ie concept being adequate to it and which language, consequently can never get quite on level

terms with or render completely intelligible" অর্থাৎ শিল্পের ধারণা হ'চ্ছে সেই উপস্থাপনা য কল্পনার সৃষ্টি, য অনেক ধারণাকে জাগায় বটে, কিন্তু তেমন কোন নির্দিষ্ট ধারণা বা স জ্ঞা তৈরি করেনা, যা' উপস্থাপনার উপযুক্ত প্রতিনিধি হ'তে পারে এবং যাকে ভাষা সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করতে পারে না। মোট কথা 'এস্থেটিক আইডিয়া' নৈর্ব্যক্তিক কোন সংজ্ঞা বা ধারণা নয়, 'র‍্যাশানাল আইডিয়া'রই আর একটা দিক বটে, কিন্তু কোন **intuition**'ই অর্থাৎ **representation of the imagination"** ঐ ধারণাকে বা ধ্যানকে ব্যক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এ কথা সত্য হলে, কাণ্টের শিল্পচিন্তাকে বোমগার্টেনেরই চিন্তার ভাষান্তরে প্রকাশ—বোমগার্টেনের **sensible and imaginative vesture of an intellectual concept** অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত সংজ্ঞার বা ধারণার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং কল্পনাকৃত পরিচ্ছদ—এই ধারণারই হুবহু নকল নয়। আমার মনে হয় ক্রোচের কাণ্ট-বিদ্বেষের মূলে অধমর্ণের মনোভাবটি কাজ করেছে। ক্রোচের চিন্তার আসল উপাদানটি ইন্‌টুইশান ও কল্পনার সমীকরণ এবং কল্পনাকে জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া বলে স্বীকার করা কাণ্টের কাছ থেকেই স গৃহীত হয়েছিল। আমরা দেখি, কাণ্টের কাছে 'ইন্‌টুইশান' হচ্ছে "রিপ্রেজেন্টেশান অফ ইমাজিনেশান" এব "ইমাজিনেশান" হচ্ছে জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ারই সৃজনশীল রূপ (**productive faculty of cognition**)। তবে ক্রোচে কাণ্টকে যে কারণে সমালোচনা করেছেন তা' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। কাণ্ট একমাত্র কল্পনাশক্তিকেই প্রতিভার সর্বস্ব বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে কল্পনা (ইমাজিনেশান) এবং বুদ্ধি (আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিঙ) এই মানসিক শক্তির সহযোগে প্রতিভা গঠিত হয়। সৃজনকালে কল্পনা বুদ্ধির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করে। কল্পনার প্রাধান্যে শিল্প হয়ে দাঁড়ায় "**inspired art** এবং রুচির বা বিচার বুদ্ধির (জাজমেণ্ট) প্রাধান্যে—শিল্প হ'য়ে উঠে, 'চারুকলা' (ফাইন আর্টস)। কাণ্টের ধারণা "কল্পনা যখন নিয়ম-রহিত ও অবাধ স্বাধীনতায় মেতে উঠে, সব সমৃদ্ধি থাকা সত্বেও, সে যা সৃষ্টি করে তা'

অর্থহীন ছাড়া আর কিছুই নয়"। এই কারণেই চারুকলা সৃষ্টির ব্যাপারে একমাত্র কল্পনাই যথেষ্ট নয়; কল্পনা, বিচারবুদ্ধি, আত্মা ও রুচি এই চারটি উপাদান আবশ্যক। এ কথা ঠিক যে কাণ্ট শিল্পসৃষ্টির জন্য একক কোন বৃত্তি নির্দেশ করতে পারেন নি, কল্পনার বুদ্ধি-নিরপেক্ষ স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি এবং অনুভব বৃত্তির সঙ্গে কল্পনার সম্পর্ক বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ধারণা গঠন করতে পারেননি এবং পারেননি ব'লেই ক্রোচে কাণ্টের মতকে বুদ্ধিবাদ প্রভাবিত ব'লে নিন্দা করেছেন। বুদ্ধিবাদী ভুল নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ এটা নয়। এখানে আমরা ক্রোচের অন্য আপত্তিটি দেখাতে চেষ্টা করব; এবং সেই আপত্তি এই যে, জাজমেণ্ট—ব্যাপারটিকে কাণ্ট চারুকলার 'কণ্ডিশিয়ো সাইন কোয়া নন" অর্থাৎ অপরিহার্য শর্ত হিসাবে গণ্য করেছেন তাকে কাণ্ট অনুভব নামক মানসিক বৃত্তির জ্ঞানাত্মক রূপ ব'লে মনে করেছেন—অনুভবের কক্ষে স্থান দিয়েছেন। ক্রোচে বলেছেন—সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে কাণ্ট এমন একটি আত্মিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন যা এক দিকে আনন্দ উপভোগ ও মঙ্গলের এলাকা থেকে অন্যদিকে সত্যের এলাকা থেকে পৃথক, "এ এমন বিশিষ্ট অনুভব ক্রিয়ার রাজ্য, যাকে তিনি বলেন—বিচার অবধারণ, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে, "শৈল্পিক বিচার"। ক্রোচে অতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন ঐ ধরনের কোন বিশেষ বৃত্তি বলে কিছু নেই। জ্ঞানাত্মিকা ও কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার মধ্যবর্তী এমন কোন অনুভব-বৃত্তি নেই যা' একাধারে জ্ঞানাত্মিকা হয়েও জ্ঞানাত্মিকা নয়, নৈতিক হ'য়েও নীতিনিরপেক্ষ, আনন্দদায়ক হ'য়েও ইন্দ্রিয় সুখকর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ক্রোচের সমালোচনা সত্য কি মিথ্যা তা বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু এই দিকেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি যে শিল্পসৃষ্টি আবেগমূলক ব্যাপার এ সংস্কার কাণ্টের মধ্যেও কাজ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্বচিন্তা পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে —কল্পনা শব্দটি বহুমুখে উচ্চারিত এবং প্রচারিত হ'লেও, কল্পনার বৈশিষ্ট্য বা সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা সংলক্ষ্য হয়ে উঠলেও, কল্পনাবৃত্তির সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক রয়েছে, কল্পনাবৃত্তি থেকেই শিল্পের জন্ম এই ধারণাটি অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে

পড়লেও, কল্পনার জন্মভূমি যে অনুভব বা আবেগ এ সংস্কার প্রবল রূপেই প্রচলিত ছিল। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন তাঁর "লিরিকাল ব্যালাডস্"-এর মুখবন্ধে এই কথা লেখেন—সব ভাল কবিতাই প্রবল আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উৎপ্লব অথবা "**poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility** অর্থাৎ কাব্যের জন্ম হয় সেই আবেগ থেকে, যে আবেগকে শান্ত অবস্থায় পুণঃস্মরণ করা হয়, অথবা জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর "পোয়েট্রি এ্যাণ্ড ইটস্ ভ্যারাইটিস' এ লেখেন—কবিতা হ'ল আবেগ যে আবেগ নির্জনে নিজের কাছে নিজে ধরা দিচ্ছে এবং নানা সংকেতে মূর্তি পরিগ্রহ করছে"। তখন বুঝিয়ে বলতে হয় না, আবেগ বা অনুভব বৃত্তিকেই কবিতার তথা শিল্পের জন্মভূমি বলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। রোমান্টিকদের ধারণা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—তাদের কাছে শিল্প অনুকরণ নয়, শিল্প এক সৃজন ব্যাপার—'**a holy, eternally creative elemental power of the world which generates all things out of itself and brings them forth productive**' (শেলিঙ)। এদের মতে, শিল্প কর্মের রূপটি শিল্পীর আবেগের পরিস্থিতির মধ্যে নিহিত। শিল্পের আরম্ভ পরিস্থিতির উপলব্ধিতে এবং শেষ পরিস্থিতি-অনুরূপ রূপ বিকল্পনায় (সংকেত) (**The from of a work of art is inherent in the emotional situation of the artist, it proceeds from his apprehension of that situation (a situation may involve either external objective phenomena or internal states of mind) and is the creation of a formal equivalence (is a symbol) for that situation……**) আসল কথা এই সব রোমান্টিকদের মনে এই ধারণাটিই কাজ করেছিল যে, শিল্পের সঙ্গে আবেগের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে, শিল্প শুধু সংজ্ঞান মনেরই ক্রিয়া নয়, আসংজ্ঞান নির্জ্ঞান মনও সৃজনী ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অনুভবও (**feeling**) অন্যতম জ্ঞানবৃত্তি। এখানেই '**feeling**' কথাটি কত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে দু' একটি কথা ব'লে নিলে সুবিধা হবে। ক্রোচের এস্থেটিক গ্রন্থ থেকে এই অর্থ-

গুলি সংগ্রহ করেছি। প্রথম অর্থে "feeling" বলতে বুঝায়—'আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা' প্রকৃতি অথবা শিল্পের বিষয়বস্তু (spirit in its passivity the matter or content of art), দ্বিতীয় অর্থে—সৃজনীবৃত্তির অনৈয়ায়িক ও অনৈতিহাসিক প্রকৃতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রতিভান (non-logical, non-historical character of aesthetic fact, that is to say pure intuition) তৃতীয় অর্থে—অজ্ঞানাত্মিকা এক প্রকার বিশেষ ক্রিয়া—যার দুটি মেরু, একটি সদর্থক অন্যটি নঞর্থক—একটি আনন্দে অন্যটি বেদনায় পরিণত। এখন প্রশ্ন—আমরা যখন শিল্পকে অনুভবের সৃষ্টি বলি, তখন উল্লিখিত অর্থের কোনটিকে গ্রহণ করি?

দ্বিতীয় অর্থে; এই অর্থে অনুভব ও ক্রোচের প্রতিভান একই ব্যাপার অর্থাৎ বিশেষ ধরনের এক প্রকার জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—জ্ঞানে জানি বিষয়কে, ভাবে জানি আপনাকে, তখন ভাব বা অনুভব যে একপ্রকার জ্ঞানবৃত্তি তা' স্বীকার করেন। কিন্তু প্রশ্ন এই, অনুভব বা আবেগ থেকে শিল্পের জন্ম এ কথা যখন বলা হয়, তখন কি ঠিক উল্লিখিত অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়? নিশ্চয় তা' হয় না। বরং এই কথাই বলা হয় যে শিল্প জ্ঞান বৃত্তির বা ইচ্ছাবৃত্তির সৃষ্টি নয় অনুভব বৃত্তির অর্থাৎ আনন্দ-বেদনা বোধের বা আবেগের সৃষ্টি—আবেগোদ্দীপিত মানসিক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ। শুধু অনুভব বা আবেগ শিল্প সৃষ্টির পক্ষে সমর্থ কারণ হ'লে—মনুষ্যেতর প্রাণীর পক্ষেও শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু আমরা দেখতে পাই জ্ঞানবৃত্তি উন্নততর না হওয়া পর্যন্ত, প্রকাশ ক্ষমতা বিশেষ স্তরে না পৌঁছানো পর্যন্ত, শিল্পের সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করা চলে যে নিছক অনুভব বা আবেগের উদ্দীপনা শিল্প সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তবে, অনুভব বা আবেগ থেকে শিল্পের জন্ম এ কথা না মানলেও, অনেকেই এ সিদ্ধান্ত মানেন যে শিল্প হ'ল আবেগের প্রকাশ অর্থাৎ শিল্পের বিষয়বস্তু হ'ল—ভাবাবেগ। শিল্প আবেগ থেকে সৃষ্ট এবং শিল্প আবেগকে প্রকাশ করে—এই দুটি সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং সেই পার্থক্য এই যে প্রথম সিদ্ধান্তে আবেগকে

শিল্পসৃষ্টির বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে আবেগকে 'বিষয়-বস্তু' হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে এই যে, যে বৃত্তি থেকে শিল্পের জন্ম সে হচ্ছে প্রকাশবৃত্তি, কিন্তু শিল্প বাহ্য ও আন্তর যে জগৎকেই প্রকাশ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে ভাবাবেগকেই প্রকাশ করে থাকে। শাস্ত্র থেকে শিল্পের পার্থক্য এইখানেই—শাস্ত্র প্রকাশ করে তত্ত্বের জগতকে, শিল্প প্রকাশ করে ভাবের জগতকে। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে এরিস্টটল তাঁর সুবিখ্যাত পোয়েটিকস্ গ্রন্থে, খুব স্পষ্ট করেই এই কথাটি বলেছেন যে শিল্প অনুকরণ বৃত্তির ফল হ'লেও, সব শিল্পের অনুকরণের বিষয় এক নয়, উপাদান বা মাধ্যম, বিষয়বস্তু ও রীতি—এই তিনের পার্থক্যে এক শিল্পের সঙ্গে অন্য শিল্পের পার্থক্য ঘটে। প্লেটো-এরিস্টটলের কাছে ভাবাবেগ বিশেষ শিল্পের অর্থাৎ সংগীতের বিষয়বস্তু বটে, কিন্তু সব শিল্পের বিষয়বস্তু নয়।

এখানে আবেগবাদীদের সঙ্গে অনুকরণবাদীদের পার্থক্য। আবেগবাদীর বিশেষ বক্তব্য হ'ল এই যে শিল্পবস্তুকে চরিত্রকে, ঘটনাকে, ভাবাবেগকে যাকেই আপাততঃ প্রকাশ করুক না কেন শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগকেই প্রকাশ করে অর্থাৎ শিল্পে যে বিশেষের রূপ নির্মিত হয় তা আসলে ভাবাবেগেরই রূপ এবং শিল্পের উদ্দেশ্য রূপ দিয়ে ভাবকে উদ্দীপিত বা ব্যক্ত করা। এই ধারণাটির উৎস সন্ধানে বের হ'লে দেখা যাবে—আদিম সমাজের মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে নৃত্যগীত করেছে বা দেবদেবীকে তুষ্ট করবার জন্য স্তবস্তুতি করেছে তখন তাঁরা সামষ্টিক আবেগে উদ্দীপিত হয়েছে—তাদের সেই সামষ্টিক আবেগ যেন নৃত্যগীতে স্তবস্তুতিতে অভিব্যক্ত হ'য়েছে। পরবর্তীকালের শিল্পকর্মের অর্থাৎ মহাকাব্য ও অন্যান্য কাব্য সম্ভোগ কালেও আমরা কাব্য বর্ণিত চরিত্রের ভাবাবেগের সঙ্গে সহানুভূতি অনুভব করায় শ্রোতাদের ও দর্শকদের ভাবাবেগে আন্দোলিত হ'তে দেখেছি, গীতি কবিতার মধ্যে কবির ব্যক্তিগত ভাবাবেগের অভিব্যক্তি দেখেছি যা শ্রোতাদের বা পাঠকদের মনে সঞ্চারিত হ'য়ে কবির মনোভাবের অনুরূপ ভাবানুভূতি জাগিয়ে দেয়। কাব্য পাঠ করে আমরা নানাভাবে আন্দোলিত

হই। নাটক দেখতে গিয়ে আমরা হাসি-কান্নার দোলায় দুলতে থাকি, গান শোনার পর মনে আমাদের ভাবের আবেগ জাগে, কখনও কখনও সুরের আবেদনে চোখ জলে ভরে উঠে—এই সব দেখে শুনেই শিল্প আবেগের প্রকাশ, শিল্পের উদ্দেশ্য আবেগের জগতকে প্রকাশ করা—এই ধারণাটি অনেকের মনে বদ্ধমূল হ'য়ে পড়েছে। আমাদের সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে যে মতবাদটি রসবাদ নামে প্রচলিত সেই মতবাদটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে গেলেও দেখা যাবে—রসবাদ আসলে ভাবাবেগবাদ। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' এই সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে—বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবের দ্বারা স্থায়িভাব ব্যক্ত হ'য়ে রসতা প্রাপ্ত হয় এবং স্থায়িভাব হ'চ্ছে রতি-হাস-শোক-ক্রোধ-উৎসাহ-ভয়-জুগুপ্সা-বিস্ময়-শম ইত্যাদি ভাববন্ধগুলি—ইংরেজিতে যাদের বলা যায়—"Psycho physical dispositions" এই ভাবগুলি ব্যক্তিকে আশ্রয় করে থাকে এবং ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটার ফলে—বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই পরিস্থিতিই বিচিত্র ভাবের স্থায়িভাবের অন্তর্গত ও পরিপোষক বিচিত্র সঞ্চারিভাবের সৃষ্টি করে এবং এইভাবে ব্যক্তি ও পরিস্থিতি আশ্রয়ে এক একটা স্থায়িভাব বিশেষ বিশেষ পরিণাম বা পরিপূর্তি লাভ করে।

এই মতবাদটির যিনি প্রথম প্রবক্তা সেই ভরত রসনিষ্পত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—"যথা হি নানা দ্রব্যব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্য সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ তথা নানা ভাবোপগমাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। যথা হি গুড়াদিভির্দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৈরৌষধিভিশ্চ ষড়্‌রসাদয়ো রসা নিবর্ত্যন্তে তথা নানা ভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তীতি।" এই কথাটি বাংলানুবাদে এরূপ দাঁড়াবে—"যেমন নানা দ্রব্য ব্যঞ্জন ঔষধি প্রভৃতি দ্রব্য সংযোগে রস তৈরী হয়। তেমনি নানা ভাবের সংমিশ্রণে রস নিষ্পন্ন হয়। যেমন গুড় প্রভৃতি দ্রব্যও ব্যঞ্জন. ওষধি প্রভৃতি দ্বারা ষড় রস তৈরী হয়, তেমনি নানা ভাবের সংমিশ্রণ ঘটলেও স্থায়িভাবগুলি রসত্ব প্রাপ্ত হয়।" এই শেষোক্ত বাক্যটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। বহু ভাবের সংযোগে বিশেষ একটি স্থায়িভাব ব্যক্ত হয় তথা রসত্ব অর্থাৎ আস্বাদ্যতা লাভ করে। আস্বাদন কথাটি

স্মরণীয়। ভাবের আস্বাদন এবং ভাবাপ্লুত হওয়া এক কথা নয়। আস্বাদন ভাবের রূপ বৈচিত্র্য উপলব্ধি—ভাবেব বোধ। বলাই হযেছে—"রসনা চ .বাধ-রূপা।" ক'বিরা তাদের সৃষ্টিতে বিভাব-অনুভাব সঞ্চারিভাবের স যোগ পরিকল্পনা করেন এবং ঐ পরিকল্পনাব সাহায্যে ভাবকে ব্যক্ত কবে পাঠক-দর্শকের আস্বাদ্য ক'রে তোলেন। এই প্রসঙ্গেই একটি প্রশ্নের মীমাংসার দাবী উঠতে পারে। কেউ হযতো বলতে পারেন· নাটক প্রসঙ্গেই ভরত বসের কথা বলেছেন, সব রকম কাব্যে রস নিষ্পত্তির সম্ভাবনা আছে কি? এই প্রশ্নটির উত্তরে নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনবগুপ্ত অভিনব ভারতীতে নিজ উপাধ্যায়েব মত উদ্ধৃত করে বলেছেন—"কাব্যোঽপি নাট্যাযমান এব রসঃ। কাব্যার্থাবিষয়ে হি প্রত্যক্ষকল্পসংবেদনোদয়ে রসোদয় ইত্যুপাধ্যায়াঃ।" অর্থাৎ কাব্যের ক্ষেত্রেও নাটকের মতোই বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবেব সংযোগ ঘটে। নাটকে .যমন এগুলি আমাদের প্রত্যক্ষ সংবেদনের বিষয়ীভূত হয়, কাব্যেও অর্থগুলি প্রত্যক্ষ সদৃশ সংবেদন জন্মায় তথা আস্বাদ্য হয়। কাব্যকৌতুক নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্নটির আলোচনা করেছেন। "প্রয়োগত্বমনাপন্নে কাব্যে নাস্বাদসম্ভব"—নাটকের মতো প্রয়োগ যোগ্যতা না থাকায় কাব্যে আস্বাদ সম্ভাবনা নেই এই আপত্তি যাঁরা তুলবেন তাঁদের আপত্তি খণ্ডনে এই কথাই বলতে হবে "বর্ণনোৎকলিতা ভোগ প্রৌঢোক্ত্যা সম্যগর্পিতা উদ্যান কান্তা চন্দ্রাদ্যা ভাবাঃ প্রত্যক্ষবৎস্ফুটাঃ" অর্থাৎ বর্ণনা দ্বারা উৎকলিত বা সংক'লিত ভোগব্যঞ্জক ও প্রৌঢোক্তি দ্বারা অর্পিত উদ্যান কান্তা চন্দ্র প্রভৃতি ভাব—এক কথায় বর্ণিত বিষয়—অপ্রত্যক্ষ হ'য়েও প্রত্যক্ষবৎ পরিস্ফুট হয়। এই ধারণা থেকেই রস শ্রব্য-দৃশ্য সব রকম কাব্যেরই—আত্মা ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। সে যাই হোক রসবাদের তাৎপর্য হ'ল এই যে কাব্যের উপস্থাপ্য বা প্রকাশ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে ভাবজগৎ। যে কাব্য যে পরিমাণে উপস্থাপ্য ভাবকে সমুচিত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবের সাহায্যে ব্যক্ত করতে পারে, সেই কাব্য সেই পরিমাণে সার্থক। তবে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে আমাদের দেশে রসবাদই শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে একমাত্র মতবাদ—সর্বজন

স্বীকৃত মতবাদ। পাশ্চাত্য দেশের মতো আমাদের দেশেও, রসবাদকে অনেকেই খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। অলংকারবাদীরা, রীতিবাদীরা, বক্রোক্তিবাদীরা, ধ্বনিবাদীরা, রমার্থবাদীরা একমাত্র ভাবের গণ্ডীর মধ্যেই কাব্যের বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে সম্মত হননি. রসবাদের অব্যাপ্তি দোষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এঁরা দেখাতে চেয়েছেন—কাব্য পাঠ করে আমরা যে আনন্দ পাই সেই আনন্দ শুধু ভাবাস্বাদন জনিত আনন্দ নয়. সুন্দর শব্দালংকার অর্থালংকার প্রয়োগের মধ্যে সুন্দর রীতির বা পদসংঘটনার মধ্যে, বিচিত্র বাগ্‌বক্রতার মধ্যে, প্রকাশ শক্তির মধ্যে নৈপুণ্য উপলব্ধি করেও আমাদের আনন্দ জন্মে থাকে। এ ছাড়া কোন-কিছুর যথাযথ বর্ণনা বা চিত্রতাকরণ থেকেও আমরা আনন্দ লাভ করিতে পারি। ধ্বনিবাদীরা অব্যাপ্তিদোষ পরিহার করতে গিয়ে কাব্যের আত্মা হিসাবে ধ্বনিকে গ্রহণ করেছেন এবং বস্তুধ্বনি অলঙ্কারধ্বনি এবং রসধ্বনি এই তিন শ্রেণীতে ধ্বনিকে ভাগ করেছেন। রসাত্মক না হ'য়েও যে বাক্য কাব্য হতে পারে—বস্তুকে অথবা অলঙ্কারকে ধ্বনিত করেও বাক্য কাব্য মর্যাদা লাভ করতে পারে এইটুকুই ধ্বনিবাদীদের বিশেষ বক্তব্য। রম্যার্থবাদী জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধর-গ্রন্থে কাব্যের সংজ্ঞা করেছেন—রমনীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্। অর্থাৎ যে শব্দ রমনীয় অর্থ প্রতিপাদন করে তারই নাম কাব্য। রমনীয়তার সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি ঐভাবে, রমনীয়তা চ লোকোত্তর আহ্লাদজনক জ্ঞান গোচরতা। লোকোত্তর আহ্লাদন এবং জ্ঞানগোচরতা এই দুটি শব্দের তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। "লোকোত্তর আহ্লাদ" ব্যক্তিগত বাসনা কামনা পরিপূর্তি জনিত আনন্দ নয়, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে—'disinterested pleasure' সেই ধরনের আনন্দ এবং সেই কারণে কোন বিশেষ বিষয়ের রূপগত সৌন্দর্য উপভোগ করার আনন্দ। এই লোকোত্তর আনন্দ অর্থাৎ রূপগত সৌন্দর্যের উপলব্ধি জনিত আনন্দ আমরা যেমন বস্তুরূপের ধ্যানে পেতে পারি, তেমনি চিন্তার যুক্তি বাঁধুনি তথা রূপের মধ্যেও পেতে পারি। এই কারণেই চিন্তার নৈর্ব্যক্তিক জগতকে শিল্পের সব্যক্তিক জগৎ থেকে পৃথক করবার জন্য শুধু 'রমণীয় শব্দ' না বলে রমণীয়

অর্থপ্রতিপাদক শব্দ কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং "অর্থ" কথাটি ব্যবহার ক'রে কাব্য বিশেষের জগতকে চিন্তার সামান্যের জগৎ থেকে পৃথক করেছেন। কিন্তু যাঁরা রসবাদী তাঁরা খণ্ডনে ক্ষান্ত হননি, তাঁরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—সব কিছুই শেষ পর্যন্ত কোন-না-কোন ভাবকে ব্যক্ত করে। রস রসাভাস ভাব ভাবাভাস, রসশবলতা, ভাবশবলতা—"সর্বেঽপি রসনাদ রসাঃ"। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক বস্তুর বা দৃশ্যের যথাযথ বর্ণনা, যাকে আমরা স্বভাবোক্তি বলে থাকি, তাকেও রসবাদীরা প্রেয়োরসাত্মক ব'লে রসবাদের ব্যাপ্তির গণ্ডীর মধ্যে স্থান ক'রে দিয়েছেন। মোট কথা, পাশ্চাত্যের সংকেতবাদীদের মতোই—রসবাদীরা কাব্যকে আবেগাত্মক বাক্য (emotive language) ব'লে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তই যেন করতে চেয়েছেন যে—শিল্প ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে মানুষের আবেগকেই —সে আবেগ ব্যক্তিগত আবেগই হোক আর পরগত আবেগেই হোক—ব্যক্ত করে থাকে; এমন কি বস্তু প্রতীতিও নিছক প্রতীতিমাত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না শেষ পর্যন্ত তা—কোন-না-কোন অনুভূতি বা আবেগে পর্যবসিত হ'য়ে যায়।

আরও সহজ ক'রে বললে বলতে হবে—মানুষ বস্তুজগতের যে রূপ উপলব্ধি করে, তা' রূপ হিসাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় বটে, কিন্তু রূপের কোন স্বাধীন সত্তা নেই, তা' ভাবের ব্যঞ্জক ছাড়া আর কিছুই নয়। ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা প্রতীতি নৈয়ায়িক বিচারের অধীন অথবা ভাবাবেগের ব্যঞ্জক—এই দুই গতি লাভ করে। নৈয়ায়িক জ্ঞানের উপাদানীভূত না হ'লেই তা' আবেগের ব্যঞ্জক হয়ে দাঁড়ায়।

এই ধারণা সত্য কি মিথ্যা সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার অবকাশ এখানে নেই, এখানে শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে 'শিল্প ভাবাবেগের প্রকাশ'—এই মতটি বেশ প্রাচীন এবং প্রবল মতবাদ। প্লেটোর সময় থেকে আরম্ভ করে আজও পর্যন্ত এ মতবাদটির ভক্তের সংখ্যা নগণ্য নয়। সৃজনশীল কল্পনাবাদের প্রতিষ্ঠা ও মহিমা যতই বৃদ্ধি পাক, এখনও আবেগবাদের পরাভব ও তিরোভাব ঘটেনি। ই. এফ. ক্যারিট মহাশয় তাঁর 'এ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু এস্থেটিক' গ্রন্থের পরিশিষ্টে "বিউটি এ্যাজ দি এক্সপ্রেশান অফ ইমোশান" (আবেগের প্রকাশ হিসাবে সৌন্দর্য) শীর্ষক

সংজ্ঞা সংকলনে প্লেটো থেকে জেণ্টাইল পর্যন্ত ৪২ জন কবি-সমালোচক-দার্শনিকের মন্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। এবং এই কথাটাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—আবেগই শিল্পের উপস্থাপ্য বিষয়বস্তু। এই মণীষীদের সকলের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে গেলে অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে তবে কয়েকজনের মন্তব্য না উদ্ধৃত করলে অবস্থাটি পরিষ্কারভাবে বুঝানো যাবে না। তাই কয়েকজনের মন্তব্য আমি উপস্থাপিত করছি। জে ডেনিস বলছেন—"কাব্যের ও চিত্রের সর্বত্র আবেগ থাকবে। আবেগের অভিব্যক্তি হিসাবেই শিল্প আমাদের এত প্রিয়।" মুরাতোরি বলছেন, —"আমরা আবেগোদ্দীপিত হয়েই কল্পনা করি বা প্রতিরূপ সৃষ্টি করি, আবেগের স্পর্শেই নির্জীব বস্তু সজীব হয়ে উঠে"। এডিসন বলেছেন—"বর্ণনা প্রশংসা পায় তখনই যখন তা' এমন কিছুকে উপস্থাপিত করে যা' পাঠকের মনে আবেগ জাগাতে মনকে আবেগমথিত করতে সমর্থ হয়।" ভিকো বলছেন—"ভাবাবেগজনক বাক্যই কাব্যিক ভণিতি।" এলিসন বলছেন—"বস্তুবৈশিষ্ট্য স্বভাবতঃ সুন্দর বা মহীয়ান নয়, আবেগজনকগুণের সংকেত বা প্রকাশ রূপেই তা' সুন্দর বা মহীয়ান। যা' আবেগের বিষয় নয় তা' কিছুতেই আস্বাদনের বিষয় হ'তে পারে না।" কাণ্ট বলছেন—"আলোকের বা শব্দের রূপান্তরের মধ্যে এমন একটি ভাষা থাকে যার সাহায্যে প্রকৃতি আমাদের সঙ্গে কথা বলে এবং যার একটা নিগূঢ় অর্থ আছে। আমরা মহীরুহকে বা প্রাসাদকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত বা মহীয়ান বলি, প্রান্তরকে হাস্যোৎফুল্ল বা আনন্দোৎফুল্ল বলি, এমন কি বর্ণরাজিকে বিশুদ্ধ, পবিত্র, কোমল বলি ; কারণ, তারা আবেগ উদ্রিক্ত করে।" কোলরিজ লিখছেন, "সমস্ত চারুকলার সাধারণ উদ্দেশ্য আবেগ উদ্দীপিত করে আনন্দ দেওয়া।" শেলী বলছেন—"ভাষা হচ্ছে মানুষের ভিতরকার সত্তার মধ্যে নিহিত আবেগের ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা"। হেগেল বলছেন—"শিল্পে মানুষের আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। শিল্প আমাদের ইন্দ্রিয়, অনুভূতি এবং আবেগ সমূহকে আলোড়িত করে তোলে। টলষ্টয় বলছেন—"মানুষের মধ্যে কোন এক সময়ে যে অনুভব জেগেছে, সেই অনুভবকে আবার নিজের মধ্যে জাগিয়ে তোলা এবং গতি, রেখা বর্ণ ধ্বনি বা

শব্দের মাধ্যমে সেই আবেগানুভবকে অন্য মনে সঞ্চার করে দেওয়া তারই নাম 'শিল্পকলা"। এমন কি, যে ক্রোচে এস্থেটিক গ্রন্থে সৃজনশীল কল্পনাবাদের বা প্রতিভানবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধে লড়াই করেছেন, বুদ্ধি ও আবেগের স্পর্শ থেকে শিল্পের বিশুদ্ধি বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন, সেই ক্রোচে পর্যন্ত তাঁর— "ব্রিভিয়ারি অফ এস্থেটিক" গ্রন্থে এই মন্তব্য করেছেন—"মহান শিল্পকর্মে স্বচ্ছ রূপের মাধ্যমে নিছক আবেগই ব্যক্ত হয়ে থাকে; "নিউ এসেস্ ইন এস্থেটিক গ্রন্থে" লিখেছেন—"প্রত্যেকটি রেখা, রঙ অথবা স্বর ভাবেরই বিগ্রহ" এবং "প্রবলেমস অফ এস্থেটিক"-এ লিখছেন, শিল্পে যা' আমাদের হৃদয়কে নাচিয়ে তোলে, আমাদের চমৎকৃত করে সে হচ্ছে আবেগ—শিল্পীর মনের আগুন—অনুভূতি।" শিল্পতত্ত্বে যাঁরা 'এম্প্যাথি'-তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরাও মূলতঃ ভাবাবেগবাদী মতপ্রবর্তক। থিয়োডোর লিপ্স লিখেছেন—"এ কথা ঠিক শৈল্পিক আনন্দের বিষয় হচ্ছে সুন্দর সুন্দর বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ, কিন্তু তার ভিত্তি হচ্ছে আমার নিজেরই ভিতরকার সত্তা। আমিই বিষয়ের মধ্যে নিজেকে সরল, লঘু, গুরু, গর্বিত ব'লে অনুভব করি......ইংগিত আমার কাছে গর্ব বা শোক প্রকাশ করে"। বিখ্যাত দার্শনিক আলেকজাণ্ডার তাঁর বহুখ্যাত "দেশ কাল ও দেবতা" নামক গ্রন্থে লিখছেন—"কোন দৃশ্যে আমরা নিজেদেরই ভাবকে আরোপ করি জড় বা চেতন বস্তুকে অনুভবশীল করে তুলি, মূর্তিকে গর্বে প্রাণবান করি। শুধু এই আরোপটুকুর জন্যই সুন্দর বস্তু প্রকাশ উৎকর্ষ লাভ করে"। টি. ই. হল্‌মে লিখছেন—"যে শিল্পকর্মকে আমরা সুন্দর বলে মনে করি তা' আমাদের আনন্দেরই বাস্তবায়িত রূপ। জ্যামিতিক শিল্পও তীব্র ধর্মীয় আবেগ জাগাতে পারে।" হলমের সিদ্ধান্তের সঙ্গে জর্জ স্যাণ্টায়নের—"সৌন্দর্য আনন্দের বাস্তবায়িত রূপ" (Beauty is objectified pleasure) এই মতটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। লিয়োন বলছেন—"শিল্প প্রকাশ করে—বাস্তবায়িত বা মূর্তায়িত করে আমাদের অনুভূতিকে বা আবেগকে বা মানসিক অবস্থাকে।" জেণ্টাইল বলছেন—"শিল্পী রূপায়িত করে একমাত্র নিজেরই অনুভূতিকে।" এই তালিকার সঙ্গে হানসলিক

রচিত 'সংগীতে সুন্দর' গ্রন্থে সংগৃহীত আবেগবাদীদের তালিকাটি পাশে রেখে পড়লে দেখা যাবে—সংগীত আবেগের প্রকাশ এই সিদ্ধান্তটি প্লেটো এরিস্টটলের সময় থেকে অপ্রতিহত গতিতে চলে আসছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হ্যানসলিকের ও অন্যান্য কল্পনাবাদীদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তটির জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়নি। এ কথা ঠিক যে হ্যানসলিকের "সংগীতে সুন্দর" আবেগ-বাদের সামনে একটি প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, খুব জোরের সঙ্গেই প্রচার করেছিল যে সংগীত কোন বিশেষ আবেগ প্রকাশ করতে পারে না, শুধু পারে স্বর-সংকেতে আবেগের গতি-প্রকৃতির সাদৃশ্য সৃষ্টি করতে কিন্তু আজও আবেগ-বাদকে কল্পনাবাদ স্থানচ্যুত করতে পারে নি ; সাধারণ অভিজ্ঞতাই আবেগবাদকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সংগীত শোনার সময়ে আমাদের মনে আবেগের উদ্রেক ঘটে এ যেমন সহজ অভিজ্ঞতা, তেমনি গীতি-কবিতায় কবির ব্যক্তিগত মনোভাব ব্যক্ত হয় এবং শ্রোতার মনেও তা একটি ভাবাবেগের সৃষ্টি করে, বর্ণনাত্মী শ্রব্য-কাহিনী-কাব্যেও যেখানে অপর ব্যক্তিদের জীবনদ্বন্দ্বের রূপ উপস্থাপিত হয় ভাবাবেগ ব্যক্ত হয় এবং দৃশ্যকাব্যেও সুখদুঃখ নানাবস্থান্তরাত্মক জীবনবৃত্ত উপস্থাপিত করা হয়—এ অভিজ্ঞতাও খুবই সহজ। তাই কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে 'শিল্প ভাবাবেগের প্রকাশ' এই ধারণাটি বহুকাল ধরে বহু মনে স্থান লাভ করে আসছে। ভাবাবেগবাদের কিছু কিছু রকম ফের লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলতে চান—বিশেষ করে যাঁরা আধ্যাত্মিকতার উপরে বেশী জোর দেন—শিল্পের উৎকর্ষ সাধারণ বা জৈবিক আবেগ জাগানোর উপরে নির্ভর করে না, শিল্পের উৎকর্ষতা বেশী হয় যত তা আধ্যাত্মিক আবেগে, দিব্য আবেশে মনকে আপ্লুত ক'রে তোলে এবং ঐ আবেগের বা আবেশের দ্বারা ইহলৌকিক চেতনা থেকে মনকে ঊর্ধ্বলোকবিহারী ক'রে তোলে। বলা বাহুল্য—দর্শনে যারা ট্রানসেনডেণ্টালিজিম অর্থাৎ অভিজ্ঞাগতিক অনুভূতির অভিলাষী, তাঁরাই সাধারণতঃ শিল্পে দিব্যানুভূতিবাদী হ'য়ে থাকেন। এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা ভাল—এই ধরনের মতবাদ গ্রহণ করলে শিল্প বিচারের কোন বাস্তব মানদণ্ড পাওয়া সম্ভব নয়। আবেগবাদের আর এক রকম-ফের হচ্ছে—

তাঁদের মত যাঁরা বলতে চান—শিল্পের উদ্দেশ্য সাধারণ আবেগ জাগানো নয়; শিল্পের উদ্দেশ্য হ'ল বিলক্ষণ একটি আবেগ—অর্থাৎ শৈল্পিক আবেগ (aesthetic emotion) জাগানো। জীবের সহজাত প্রবৃত্তির—(psychophysical disposition or instincts) সঙ্গে এই আবেগের কোন সম্পর্ক নেই; এ আবেগ—তাৎপর্যপূর্ণরূপ (significant form) উপলব্ধি করার আবেগ, আত্মার গভীরতর একটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ার আবেগ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার এঁরা তাৎপর্যপূর্ণ রূপের সংজ্ঞা দিতে বলেন—তাৎপর্যপূর্ণ রূপ হচ্ছে সেইরূপ যা শৈল্পিক আবেগ জাগাতে সমর্থ এবং শৈল্পিক আবেগ হচ্ছে সেই আবেগ যা তাৎপর্যপূর্ণ রূপের উপলব্ধি থেকে জন্মে। এ ধরনের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই সন্তোষজনক নয়। তারপর এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, শৈল্পিক আবেগ শৈল্পিক আনন্দ থেকে পৃথক কোন বিষয় কিনা তা এদের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। তবে তা না উঠলেও, একথা ঠিক যে এঁরা এই কথাই বলতে চান—শৈল্পিক আবেগ সৃষ্টি করাই শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য, আর সার্থক রূপ ঐ আবেগ প্রকাশেরই সমর্থ উপায় বিশেষ।

শিল্পের সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক আনুষঙ্গিক অথবা আন্তরিক কিনা এ নিয়ে যেমন মতভেদ আছে এবং ঐ সম্পর্ক আন্তরিক বা আত্মিক ব'লে গণ্য ক'রে আবেগবাদ গড়ে উঠেছে, তেমনি শিল্পের সঙ্গে আনন্দের সম্পর্ক সম্বন্ধেও অনুরূপ মতভেদ আছে এবং আনন্দকে শিল্পের অন্তরাত্মা বলে মনে করে আনন্দবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দার্শনিক হিসাবে যাঁরা আনন্দকেই পরমার্থ ব'লে মনে করবেন, উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে এক হ'য়ে বলবেন—আনন্দ থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, আনন্দেই সব কিছুর স্থিতি এবং আনন্দতেই সব কিছুর লয়, যাদের দৃষ্টিতে—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি তাঁরা নিশ্চয়ই এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছাবেন—রবীন্দ্রনাথ যেমন পৌছেছেন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দস্বভাবই অনন্তস্বভাব এবং ঐ স্বভাবেরই মধ্যে প্রকাশতত্ত্ব নিহিত. আনন্দস্বভাবেই ব্রহ্ম অনন্ত হয়েছেন, নিজেকে রূপে রূপে প্রকাশ করেছেন। এই স্বভাবের ক্রিয়াই মানুষের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। সৎ স্বভাবে মানুষ টিঁকে থাকার জন্য চেষ্টা করছে। চিৎ স্বভাবে সে

সব কিছু জানতে চাইছে আর আনন্দ স্বভাবে অনন্ত হতে চাইছে, নিজেকে বহুরূপে বিলসিত করতে চাইছে—এক কথায় নিজেকে সংস্কৃত তথা সৃষ্টি করছে। এই সৃষ্টিরই নাম শিল্প বা আত্মসংস্কৃতি। লক্ষণীয়—সৎ-স্বভাব চিৎ-স্বভাব এবং আনন্দ-স্বভাব একই ব্রহ্মের স্বভাব বটে, কিন্তু তিনটি স্বভাব স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র বলেই স্রষ্টার বা শিল্পীর প্রকাশ মূলতঃ আনন্দেরই প্রকাশ। 'রূপং রূপং প্রতিরূপং' ঐ আনন্দেরই বাস্তব স্থিতি। আনন্দবাদীর কাছে—শিল্পের মূল্য উপযোগ মূল্য নয়, এবং সত্যমূল্যও নয়, শিল্পের মূল্য আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশ মূল্য বা সৌন্দর্য মূল্য হলেও, আসলে আনন্দ-মূল্য। শিল্পে রূপ-সৌন্দর্য উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হ'চ্ছে আনন্দ। এই আনন্দের সঙ্গে দিব্যোপলব্ধিজনিত আনন্দের কোন পার্থক্য নেই এবং তা' নেই বলেই দিব্যানুভূতির মতোই—অনির্বচনীয়। আনন্দকে এইভাবে যাঁরা পরমতত্ত্ব হিসাবে দেখেন না, তাঁদের মধ্যেও অনেকে শিল্পকে আনন্দসম্ভোগেরই সামগ্রী হিসাবে গণ্য করে থাকেন। এ আনন্দকে সাধারণ ভাবে—তিনশ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। একশ্রেণীতে আছেন তাঁরা যাঁরা শিল্পের আনন্দকে ব্যক্তিগত অর্থাৎ জৈব-মানসিক বাসনা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দ ব'লে গণ্য করে থাকেন; এঁরাই শিল্পতত্ত্বে 'হেডনিষ্ট' নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে কেউ শৈল্পিক আনন্দকে ইন্দ্রিয়-সুখের, কেউ বাড়তি মানসিক শক্তির অভিব্যক্তির বা খেলার, কেউ আত্মপ্রতিষ্ঠা কামনা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দের কেউ আত্মপ্রদর্শনের বা অহঙ্কার চরিতার্থ হওয়ার আনন্দের কেউ অবদমিত কামনা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দের এমনি সব ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা পরিপূরণের আনন্দের সমগোত্রীয় বলে মনে করেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন তাঁরাই যাঁরা শৈল্পিক আনন্দকে শৈল্পিক 'আবেগের' মতো একটা বিলক্ষণ আনন্দ ব'লে বিশুদ্ধ রূপোৎকর্ষের উপলব্ধি জনিত আনন্দ ব'লে মনে করেন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে আছেন সেই মধ্যপন্থাবলম্বকারীরা যাঁরা শৈল্পিক আনন্দকে একাধারে রূপমূল্যবোধজনিত আনন্দ এবং বাসনা চরিতার্থ হওয়ার আনন্দ—এই দুই আনন্দের সংমিশ্রিত রূপ বলে মনে করেন। প্রথম শ্রেণীর

যেমন শিল্প সম্ভোগের বিশুদ্ধ আনন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত, দ্বিতীয় শ্রেণী তেমনি শিল্পের আনন্দ থেকে উপযোগকে বা ব্যক্তিগত বাসনাপরিপূরণের সম্ভাবনাকে সরিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। তৃতীয় শ্রেণী এই দুই অতিকোটিক মতের সমন্বয় করে এই কথাই বলতে চায় যে—শিল্পে সৌন্দর্য বা কলা-মূল্য এবং প্রভাব বা উপযোগ-মূল্য একই আধারে থাকে এবং এই দুই মূল্যের পূর্ণ হিসাব করেই শিল্প—সমালোচনা করা উচিত। এই মতের জোরালো সমর্থন করেছেন শ্রদ্ধেয় হ্যারোল্ড ওসবোর্ণ তাঁর 'এস্থেটিক এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজিম' গ্রন্থে। তিনি লিখছেন—"আমি মনে করি এই সমালোচনা-গত সমস্যার একটিমাত্র সমাধানই আছে এবং সেই সমাধান হচ্ছে একদিকে সাহিত্যের সাহিত্যিক উৎকর্ষ অর্থাৎ সৌন্দর্যমূল্য, অন্যদিকে সাহিত্যের মহত্ত্ব-মূল্য—এই দুই মূল্যের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে নেওয়া। এটা স্বীকার না করা পর্যন্ত আমরা যে সব কথা বলব তা' শুধু রহস্যই সৃষ্টি করবে।" ওসবোর্ণ সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে এই উক্তি করলেও, শিল্পের সৌন্দর্যমূল্য এবং মহত্ত্বমূল্য বিচার করা যে প্রত্যেক শিল্পের জন্যই আবশ্যক এইটিই তাঁর বলার অভিপ্রায়। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করাতে চাই যে এই দুই মূল্যের হিসাব না করলে শিল্পবিচার সম্পূর্ণ হয় কি না এ নিয়ে বাগবিতণ্ডা বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছে। এই সমস্যাটিই—'গুড আর্ট' এবং 'গ্রেট আর্টে'র সমস্যা নামে পরিচিত। শিল্পকে সুন্দর হতেই হবে, সুন্দর না হ'লে শিল্প তার প্রাথমিক শর্তই লঙ্ঘন করে এ কথা যেমন সকলেই স্বীকার করেছেন, তেমনি এ কথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের বা মহত্ত্বের তারতম্য শিল্পের সামগ্রিক আবেদনে ইতরবিশেষ ঘটে—শিল্পের সামগ্রিক আবেদনে বিষয়বস্তুর আবেদনও একটা বড় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এরিস্টটলের চিন্তাতে আমরা এই সমস্যার প্রথম চেতনা লক্ষ্য করে থাকি। শৈল্পিক আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একস্থলে বলেছেন, শিল্প আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেয়—জীবনরহস্যকে জানায় বলে আমরা শিল্প থেকে আনন্দ পাই; অন্যস্থলে বলেছেন—শিল্পের আনন্দ যথাযথ অনুকরণ দেখায় বা সুন্দর সৃষ্টিনৈপুণ্য

গঠন-সামঞ্জস্য দেখার আনন্দ। এরিষ্টটলের মতো যাঁরাই শিল্পকে কোন বস্তু বিশেষের প্রকাশ বলে মনে করেন—বিষয়নিরপেক্ষ রূপ পরিকল্পনার কসরৎ বলে গণ্য করেন না, তাঁরা শিল্পসমালোচনায় একদিকে বিষয় বস্তুর গৌরব অন্যদিকে কলা-সৌন্দর্য অর্থাৎ রূপকর্মের গুণাবলী—অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে সামঞ্জস্য বা সমন্বয়, উপাদান যোজনায় ঔচিত্য প্রভৃতি বিচার করে আসছেন। একখানি লঘু প্রহসন শিল্প হিসাবে নির্দোষ তথা সুন্দর আখ্যা পেতে পারে কিন্তু একখানি গুরুগম্ভীর ট্র্যাজিডি কলাকৌশলে চিত্তাকর্ষক ও নির্দোষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'মহান্' আখ্যা লাভ করে এবং করে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও মহত্ত্বের জন্যই। 'কলা কৈবল্যবাদী' ওয়ালটার পেটার মহাশয় এ বিষয়ে যে মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। পেটারের মত—'সব সৌন্দর্যই শেষ পর্যন্ত সত্যের সূক্ষ্মতা, অথবা যাকে আমরা বলি প্রকাশ (এক্সপ্রেশান) —অন্তরের ধ্যানের সঙ্গে বাক্যের সূক্ষ্ম নিবিড় সম্পৃক্তি বা সাযুজ্য।.....এই সাযুজ্য আর কিছুই নয়—The unique word, phrase, sentence, paragraph, essay or song absolutely proper to the single mental presentation or vision within" এই সাযুজ্য যখন ঘটে তখনই রচনা সুন্দর শিল্পরূপ লাভ করে। কিন্তু সুন্দর হলেই শিল্প মহান্ হয় না—The distinction between great art and good art depending immediately, as regards literature at all events not on its form, but on the matter"—(স্টাইল প্রবন্ধ—৩৫-৩৬পৃঃ) এই দিক থেকে শৈল্পিক আনন্দের উৎস দুটি—এক রূপগত সৌন্দর্য দুই—বিষয়বস্তুর প্রকৃতি, পেটারের ভাষায়—Its alliance to great ends or the depth of the note of revolt or the largeness of hope in it' —মহান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিদ্রোহের সুরের গভীরতা বা উদার 'আশার ব্যঞ্জনা' কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রশ্নটি এই—আনন্দের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক আনুষঙ্গিক অথবা স্বাভাবিক? আরো নির্দিষ্টভাবে প্রশ্নটিকে

উপস্থাপিত করলে এরূপ দাঁড়াবে—আনন্দ শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ কি না? এই প্রশ্নটির আলোচনায় ক্রোচে যে কথাগুলি বলেছেন সেগুলি খুবই প্রণিধানযোগ্য। অনেকেই জানেন—ক্রোচে প্রতিভানবাদী বা সৃজনশীল কল্পনাবাদী এবং ক্রোচের কাছে কল্পনা একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জ্ঞানবৃত্তি। একদিকে তা নৈয়ায়িক জ্ঞান থেকে অন্যদিকে আর্থনৈতিক ও নৈতিক ক্রিয়া থেকে পৃথক। ক্রোচের মতে শিল্পের সঙ্গে আনন্দের যোগ আনুষঙ্গিক। তিনি বলছেন—'Indeed it (আনন্দ) accompanics them of necessity, because they are all in close relation both with one another and with the elementary volitional form. Therefore each of them has for concomitants individual volitions and volitional pleasures and pains as known feeling. But we must not confound a concomitant with the principal fact and substitute the one for the other. The discovery of the truth or the fulfilment of a moral duty produces in us a joy which makes vibrate our whole being, which by attaining the aim of those forms of spiritual activity attains at the same time that to which it was practically tending as its end. Nevertheless economic or hedonistic satisfaction, ethical satisfaction, aesthetic satisfaction, intellectual satisfaction, though thus united remain always distinct"এ (Aesthetic feelings—page 76)। ক্রোচের বক্তব্যের আসল কথা এই যে মূল বাসনা নানা বিষয়াকাঙ্ক্ষার খাতে শাখায়িত হ'য়ে বিশেষ বাসনা বা চাহিদা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বাসনার পরিপূরণে সমস্ত সত্তার মধ্যে আনন্দের উত্তেজনা জাগে এবং বাসনার অপরিপূরণে বেদনা বা দুঃখ জাগে। বাসনা মাত্রেই যেহেতু বিশিষ্ট সেইহেতু আনন্দও বিশিষ্ট। মূল বাসনার সঙ্গে ক্রিয়াগুলির (প্রাতিভানিক, নৈয়ায়িক, আর্থনৈতিক ও নৈতিক) যোগ থাকলেও, ক্রিয়াগুলি নিজ বিশেষত্বে সর্বদাই স্বতন্ত্র। অর্থাৎ প্রাতিভানিক ক্রিয়া জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া বটে কিন্তু এই ক্রিয়া দ্বারা আত্মা বিশেষ বিষয়কে

চাইছে। এই চাহিদার পূরণ ঘটলে যে আনন্দ হয় তাকে আমরা বলি শৈল্পিক আনন্দ, নৈয়ায়িক জ্ঞানের চাহিদা পূর্ণ হলে যে আনন্দ হয় তাকে বলি বৌদ্ধিক আনন্দ, আর্থনৈতিক চাহিদা পূর্ণ হ'লে যে আনন্দ হয় তার নাম আর্থনৈতিক বা "হেডনিষ্টিক" আনন্দ, নৈতিক চাহিদা পূর্ণ হ'লে যে আনন্দ জন্মে তাকে বলা হয় নৈতিক আনন্দ। এই আনন্দগুলির উৎস মূল বাসনা হলেও, বিশেষ বিশেষ বাসনার পরিপূরণজনিত স্বতন্ত্র আনন্দ যে বিষয়ের চাহিদা বাসনাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে সেইটিই—'মুখ্য', আনন্দ আনুষঙ্গিক। মোট কথা আনন্দকে শিল্পের স্বরূপলক্ষণ বা বৈশেষিক লক্ষণ করা চলে না, কারণ, আনন্দ একমাত্র শিল্পের চাহিদারই ফলশ্রুতি নয়, প্রত্যেক চাহিদারই পরিপূরণ ঘটলে আনন্দ হয়। এ কথা আমরা বলতে পারিনে যে যা কিছু আমাদের আনন্দ দেয় তা'ই শিল্প, তাহলে নৈয়ায়িক জ্ঞান, আর্থনৈতিক কামনার বিষয়, নীতি এবং আরও অনেক কিছুই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়বে। বাসনা যখন বহুশাখায় শাখায়িত এবং শাখায়িত ব'লেই স্বতন্ত্র, এবং প্রত্যেক বিশেষ বাসনার পরিপূর্তিতে বিশেষ জাতীয় আনন্দ হয়, তখন সাধারণভাবে আনন্দ শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ হ'তে পারে না। যদি সাধারণ আনন্দকে বিশেষায়িত করবার জন্য রূপ দেখার বা রূপ সৌন্দর্যের এই বিশেষণ দেওয়া হ'য়, তা' হ'লে এই কথাই বলতে হ'বে যে শিল্পের বিশেষত্ব রয়েছে আনন্দের মধ্যে নয়, বিশেষত্ব রয়েছে—রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যে, রূপের অভিব্যক্তির মধ্যে। বলা বাহুল্য, আনন্দকে শিল্পের স্বরূপলক্ষণের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে, এইটিই আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে একমাত্র রূপোপলব্ধি ছাড়া আর কোন কিছু থেকেই আমরা আনন্দ পাইনে, বৌদ্ধিক আনন্দ, আর্থনৈতিক আনন্দ, এবং নৈতিক আনন্দ ব'লে কোন কিছু নাই। নিশ্চয়ই একথা প্রমাণ করা যাবে না এবং যাবে না বলেই 'আনন্দ' রূপ একটা সামান্য অনুভূতিকে (feeling) সব রকম বাসনার আনুষঙ্গিক মানসিক ব্যাপারকে—একটি বিশেষ চাহিদার স্বরূপ লক্ষণ ব'লে গণ্য করা চলবে না। রবীন্দ্রনাথের মতো আমরা যদি আনন্দকে, সংস্কারের

এবং চিৎস্বভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি স্বভাব (attribute) বলে গণ্য করি এবং আনন্দতত্ত্বের মধ্যেই প্রকাশতত্ত্বকে নিহিত করতে চাই তা হ'লে অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না।

আমরা দেখেছি—আবেগবাদীদের মধ্যে সাধারণ আবেগবাদী, দিব্যাবেগ-বাদী এবং শৈল্পিক আবেগবাদী এই তিন সম্প্রদায় রয়েছে, তেমনি আনন্দ-বাদীদের মধ্যেও দিব্যানন্দ—লৌকিক আনন্দ এবং শৈল্পিক আনন্দ এই তিন প্রকার আনন্দের ভিত্তিতে তিনটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। যাঁরা ব্রহ্মবাদী হেগেলের মতো Absolute Idealist বা স্পিনোজার মতো সাবসট্যান্সবাদী তাঁরা আনন্দকে ব্রহ্মের (এ্যাবসোলিউটের বা সাবস্-ট্যান্সের) "মোড্" বা স্বভাব বলে গণ্য করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে চেয়েছেন যে শিল্পীরা শেষ পর্যন্ত ঐ অখণ্ড দিব্য আনন্দকেই শিল্পে প্রকাশ করতে চেষ্টিত। লৌকিক আনন্দবাদীরা—যাদের 'হেডনিষ্ট' বলা হয়—শিল্পকে লৌকিক বাসনা-পরিপূরণজনিত আনন্দের ব্যঞ্জক ব'লে মনে করেন এবং শৈল্পিক আনন্দবাদীরা—শৈল্পিক আবেগবাদীদের মতো—আনন্দবাদের অতি-ব্যাপ্তি-দোষ এড়াবার জন্য আনন্দের আগে বিশেষণ জুড়ে দিয়েছেন —disinterested, impersonal, অলৌকিক, লোকোত্তর ইত্যাদি। এঁরা বলতে চান শিল্প যে আনন্দ সৃষ্টি করতে চায় তা' সাধারণ লৌকিক আনন্দ নয়, দিব্যানন্দও নয়, তা' শিল্প নিহিত রূপসৌন্দর্য উপলব্ধির আনন্দ। কাণ্টের disinterested pleasure, আমাদের সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের রসের অলৌকিকত্ব, এবং রমণীয়ার্থ প্রভৃতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে-সব কথা বলা হয়েছে, তাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই, এখানে প্রথমতঃ এই কথাটি বলতে চাই যে শিল্পের সংজ্ঞা দিতে শিল্প তাই যা' অলৌকিক আনন্দ সৃষ্টি করে—এই কথা বলা, এবং অলৌকিক আনন্দের সংজ্ঞা দিতে, অলৌকিক আনন্দ তাই যা' শিল্প উপভোগ থেকে জন্মে এ কথা বলা, প্রকৃত সংজ্ঞানিরূপণের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ অলৌকিক আনন্দের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা

বা ধারণা না পাওয়া পর্যন্ত শিল্পের প্রকৃতি কিছুই বুঝা যায় না। এখানে অলৌকিক আনন্দ—'disinterested, pleasure' সম্বন্ধে দু'একটি কথা বললে নিশ্চয়ই অবান্তর কিছু বলা হবে না। আমরা আগেই বলেছি—আনন্দ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ বাসনা পরিপূরিত হ'লে সত্তার মধ্যে যে একটা সুখদায়ক স্নায়বিক উদ্দীপনার বা তরঙ্গ প্রবাহের সৃষ্টি হয় এক মানসিক ভাবান্তর ঘটে, সেই অবস্থাটি। ব্যক্তির বাসনা বা চাহিদা না থাকলে আনন্দের কোন সম্ভাবনা থাকে না এ কথা সত্য হ'লে—আনন্দ মাত্রেই ব্যক্তি বাসনার পরিপূরণজনিত মানসিক অবস্থা বিশেষ এবং সেই হিসাবে —লৌকিক বা interest-আশ্রয়ী। তা' হ'লে আনন্দ অলৌকিক (disinterested) হবে কি করে? প্রয়োজন বিমুক্ত হবে কি করে? সুতরাং শিল্প অলৌকিক বা অপ্রয়োজনের আনন্দ সৃষ্টি করে—এ কথা বলার তাৎপর্য কি? ও কথার কোন বিশেষ অর্থ আছে কি? লৌকিক আনন্দের অলৌকিক পরিণাম সম্ভব কি? এ কথা সত্য যে শিল্পের দ্বারা আমাদের বিশেষ একটি চাহিদার পরিপূরণ ঘটে—যে চাহিদা কোন বস্তুর তত্ত্বের চাহিদা, তথ্যের চাহিদা, উপযোগের চাহিদা, নীতির চাহিদা নয়। আমরা যখন কোন বিষয়ের তত্ত্ব জানতে আগ্রহী বা তার ইতিহাস জানতে ইচ্ছুক, বিষয়টি আমাদের জীবনযাপনের পক্ষে উপযোগী কি না—অর্থাৎ বিষয়টির উপযোগিতা জানতে চাই, বিষয়টি আমাদের নৈতিক চরিত্রের উপরে কি প্রভাব বিস্তার করে তা'র হিসাব করি, তখন বিষয়টি আমাদের ব্যক্তিগত বাসনা-কামনার সঙ্গে (interests), অভিযোজন প্রচেষ্টার সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত থাকে এবং তা থাকে বলেই আমরা বলে থাকি—বিষয়টি আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থাৎ বিষয়টি আমাদের বৌদ্ধিক চাহিদার অথবা আর্থনৈতিক চাহিদার অথবা নৈতিক চাহিদার সঙ্গে যুক্ত। অন্যপক্ষে আমরা যখন বৌদ্ধিক চাহিদার বিষয় হিসাবে বিষয়কে না চাই—বিষয়ের তত্ত্ব বা তথ্য জানতে না চাই, আর্থনৈতিক চাহিদার বিষয় হিসাবে বিষয়কে না চাই

অর্থাৎ বিষয়ের উপযোগিতা চিন্তা না করি, অথবা বিষয়কে নৈতিক চাহিদার বিষয় হিসাবে না দেখি তখন আমরা বিষয়কে এমন একটি চাহিদার বিষয় হিসাবে দেখি যা' আমাদের অভিযোজন প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বা প্রত্যক্ষযোগে যুক্ত নয়, যাকে বলা হয়—রূপ উপলব্ধির চাহিদা। এই চাহিদার বৈশিষ্ট্য এই যে—অভিযোজন প্রচেষ্টার সঙ্গে এ প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত নয় এবং যুক্ত নয় বলে ব্যক্তিগত বাসনা হওয়া সত্বেও, অব্যক্তিগত —ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা থেকে দূরে অবস্থিত, অলৌকিক পর্যায়ে উপনীত। বিষয় থেকে আমরা যখন তত্ত্ব, তথ্য, উপযোগ, নীতি প্রভৃতি বিবেচনা বাদ দিয়ে রাখি তখন বিষয়টির মধ্যে আমরা রূপ মূল্য অর্থাৎ সৌন্দর্য-মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্যই সন্ধান করিনে বিষয়টিকে অর্থাৎ প্রয়োজন বিযুক্ত করে দেখতে চাই, তার স্বরূপে দেখতে চাই। প্রয়োজন বিযুক্ত করে না দেখলে বিষয়কে স্বরূপে দেখা সম্ভব নয় বলেই, প্রয়োজন বিযুক্ত করে দেখার অর্থ বিষয়ের নিছক রূপটি দেখা বলে—'তত্ত্ব তথ্য উপযোগ নীতি প্রভৃতি 'ইণ্টারেষ্ট'' বাদ দিয়ে দেখা বলে নিছক রূপ উপলব্ধির চাহিদা লৌকিক হয়েও অলৌকিক এবং তার পরিপূরণে যে আনন্দ তা' অলৌকিক আনন্দ disinterested pleasure—'অপ্রয়োজনের আনন্দ'। শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী—(এস্থেটিক এ্যাটিচিউড্) যে দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পী বিষয়কে গ্রহণ করে থাকেন এবং যে দৃষ্টিকোণ থেকে রসিকরা শিল্প সম্ভোগ করে থাকেন আসলে বিষয়কে—সমস্ত স্বার্থবোধ থেকে বিযুক্ত করে, তার স্বরূপটি অর্থাৎ রূপোৎকর্ষ সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধি করার মনোভঙ্গী। আমরা যখন দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে বিষয়কে দেখতে চাই, তখন বিষয় থেকে তত্ত্ব আবিষ্কার করতে চাই, বিষয়ের তত্ত্ব জানতে চাই ঐতিহাহিক দৃষ্টিতে বিষয়কে দেখতে যাই তখন বিষয়ের তথ্য বা ইতিহাস জানতে চাই এইভাবে আর্থনৈতিক দৃষ্টিতে উপযোগ এবং নৈতিক দৃষ্টিতে নৈতিক প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করতে চাই, অর্থাৎ এই সব দৃষ্টিকোণ থেকে

আমরা যখন বিষয়কে দেখি, তখন বিষয়কে বিশেষ বিশেষ স্বার্থের—(interest)-এর অধীন করে দেখতে চাই, কিন্তু যখন শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তখন—বিষয়ের রূপমূল্য ছাড়া আর কিছুরই হিসাব করিনে। বিষয়কে স্বরূপে দেখতে চাই। রূপীকে নিছক রূপের সীমায় আবদ্ধ করে দেখা মানেই প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে দেখা ; কারণ রূপ রূপীর অস্তিত্বের—প্রাথমিক শর্ত বা ধর্ম বলে তথাকথিত ইণ্টারেষ্টের গণ্ডীর বাইরে।

এবার আবেগবাদ ও আনন্দবাদের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করলে শিল্প-সমালোচনায় যে সমস্যা দেখা দেবে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ব'লেই আমার এই দ্বিতীয় বক্তৃতা শেষ করছি। শিল্প আবেগের বা আনন্দের প্রকাশ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে, শিল্পের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারের 'সূত্র হবে এই, যে শিল্পকর্ম আমাদের মনে অভিপ্রেত আবেগকে বা আনন্দকে বেশীমাত্রায় উদ্রিক্ত করে সেই শিল্প উৎকৃষ্ট, যা' আবেগ বা আনন্দকে জাগাতে অক্ষম তা' অপকৃষ্ট। আবেগ বা আনন্দকে মানদণ্ড করলে প্রথমেই এই অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হবে যে আবেগের বা আনন্দের মাত্রা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন বলে অপরিমেয়। হ্যারোল্ড ওসবোর্ণ মহাশয় তাঁর 'এস্থেটিক এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজিম' গ্রন্থের ১২৯ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা'কে উল্লিখিত উক্তির সমর্থক হিসাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে— "as an instrument for recording the relative degrees of beauty inherent in various works of art as a criterion for assessing and comparing artistic excellence, a thermometre as it were of beauty pleasurability is purely private and has no validity form man to man" অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পকর্মের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় যে সৌন্দর্য থাকে তা' পরিমাপ করার যন্ত্র হিসাবে শৈল্পিক মূল্য নির্ধারণের এবং তুলনা করার মানদণ্ড হিসাবে—সৌন্দর্যের তাপমান যন্ত্র হিসাবে আনন্দজনকতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তা পৃথক। মোট কথা আবেগকে বা আনন্দকে শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ করলে

শিল্প সমালোচনাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত করে তোলা হবে, ব্যক্তির আবেগ ও আনন্দের উপরে নির্ভরশীল করে তোলা ব্যক্তিগত অনুভবের উপরে—ভালো-লাগা মন্দ-লাগার উপরে ছেড়ে দিতে হবে এবং তা দিলে সমালোচনায় অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করা হবে। এ বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করা হবে; সুতরাং এ বক্তৃতা এখানেই শেষ করছি।

শিল্পতত্ত্বে কল্পনাবাদ ও অবস্তুবস্তুকিঞ্চিদ-বাদ

আগের দুটি বক্তৃতায় আমি প্রথমতঃ বাস্তববাদী এবং দ্বিতীয়তঃ আবেগবাদী ও আনন্দবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং মনে মনে এ আশা পোষণ করছি যে আপনারা ঐ মতবাদগুলির বক্তব্য ও তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন, এবং ঐ মতবাদগুলির যে কোন একটিকে সত্য বলে গ্রহণ করলে শিল্প-সমালোচনায় কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে—কোন্ মূল্যকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত হয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনারা ঐ মতবাদগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করে এই ধারণাই পোষণ করেছেন যে ঐ সব মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন যে শিল্পীর কাজ জগতের বিচিত্র প্রকাশের কোন-না কোন একটা দিক বা অভিব্যক্তিকে—সে অভিব্যক্তি বাহ্য বস্তুরূপই হোক অথবা অন্তর্জগতের মানসিক অবস্থার রূপ—ভাবাবেগ বা আনন্দই হোক তাদের উপস্থাপিত করা, রূপায়িত করা। শিল্পী রূপকার। তাঁর কর্ম রূপকর্ম সেই রূপকর্ম রূপসংস্কারসাপেক্ষ এবং রূপ-সংস্কারের জন্য ইন্দ্রিয়-উপলভ্য বাস্তব জগৎ আবশ্যক। মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর থেকে সুতো তৈরি করে জাল তৈরি করে মন তেমনিভাবে ভিতর থেকে—রূপের উপাদান সৃষ্টি করে রূপ তৈরী করতে পারে না। রূপের জন্য মনের জাগতিক অভিজ্ঞতা থাকা চাইই চাই এবং আমরা যাকে আকার বলি সেই আকৃতির ধারণাও বাইরের অভিজ্ঞতা থেকে আসে। এই ধরনের ধারণা বস্তুবাদীরা পোষণ করে থাকেন। কারণ বস্তুবাদী দর্শন মনকে "চিন্তাক্ষম বস্তু" বিশেষ বলে মনে করেন। এম্পিরিসিষ্টদের ধারণা মন যেন "টেবুলা রসা" 'শাদা পাতা' ইন্দ্রিয়-প্রতীতির লেখা পড়ে পড়ে শাদা পাতা রূপের সংস্কারে ভরে যায়। শিল্পীরা এই সংস্কার সমূহকে ইচ্ছার দ্বারা সাজিয়ে গুজিয়ে নানা রূপে প্রকাশ করে থাকেন। অধ্যাত্মবাদীদের বা ভাববাদীদের দৃষ্টি স্বতন্ত্র। তাঁরা বস্তুজগৎ এবং

চৈতন্য জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে এবং বস্তুজগৎ আগে কি চৈতন্য আগে এ প্রশ্ন সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে থাকেন। এঁরা আত্মাকে বা চৈতন্যকে পারমার্থিক সত্তা বলে এবং বস্তুজগতকে চৈতন্যের পরিণাম কখনও বা চৈতন্য জগতের সমান্তরাল সত্তা বলে মনে করে থাকেন। এই মনে করার তাৎপর্য টুকু ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার এবং শিল্পদর্শনে তার প্রভাব কি তা' তলিয়ে বুঝা আবশ্যক। যাঁরা মানুষের মনকে আধ্যাত্মিক রহস্য মণ্ডিত করে দেখেন মনকে বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা এবং বস্তুনিরপেক্ষভাবে রূপকল্পনা করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন, এক কথায় মনকে অতিজাগতিক অস্তিত্বের অধিকারী বলে—"ট্র্যান্সেনডেণ্টাল" বলে মনে করেন তাঁরা বস্তুবাদীদের ধারণা থেকে ভিন্ন ধারণা পোষণ করবেন—স্বাধীন রূপকল্পনার ক্ষমতার ভিত্তির উপরে শিল্পতত্ত্বকে দাঁড় করাবেন এ খুবই স্বাভাবিক। বিশুদ্ধ কল্পনাবাদ এবং অপূর্ববস্তুবাদ বা অবস্তুবস্তুকিঞ্চিদবাদ এই ভাববাদী ধারণারই—স্বাভাবিক পরিণতি। মন জাগতিক রূপের ধার না ধেরেই রূপ তৈরি করতে পারে অথবা জাগতিক অভিজ্ঞতাজাত উপাদানকে নিয়ে মনঃকল্পিত স্বতন্ত্র রূপ গড়তে পারে—এমন কি বস্তুশূন্য বিশুদ্ধ রূপও ধ্যান করতে পারে, এই ধারণার যথার্থ ইতিহাস বস্তুবাদী ও ভাববাদী দর্শনের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই জানা সম্ভব। আশা করি আমি সামান্যভাবে এই দুই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পদর্শনে তারা কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তার রূপরেখা তুলে ধরতে পেরেছি। অবশ্য আগের আলোচনা শুনে কারো কারো মনে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে—বস্তুবাদীরা কি কল্পনাবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেননা? বস্তুবাদীরা কি তবে অনুকরণবাদী? মনে যা' প্রতিবিম্বিত হয় শুধু তাকেই প্রকাশ করেন? ইচ্ছার দ্বারা প্রতীতির সংশ্লেষ-বিশ্লেষ ঘটিয়ে নতুন রূপ পরিকল্পনা করতে পারেন না? বস্তুবাদ, বিশেষতঃ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (ডায়ালেকটিকাল মেটি-রিয়ালিজ্‌ম্) মনকে নিষ্ক্রিয় পদার্থ বলে মনে করে না। মানসিক ক্রিয়ার প্রত্যেকটিকেই তাঁরা স্বীকার করেন, তবে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের দ্বার

রূপে কল্পনা করেন এবং—ইন্দ্রিয়ে গৃহীত প্রতীতিসমূহকে উন্নততর মানসিক ক্রিয়ার—perception imagination. conception প্রভৃতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন। আমরা দেখি বস্তুবাদী দর্শনে perception-কে "higher form of sensory knowledge" অর্থাৎ যাতে একটা কোন একটা বস্তুর রূপ তার সমগ্রতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মনে উপস্থাপিত হয়। "Idea"কে বলা হয়েছে—"reproduction in man's mind of earlier perceptions" এবং concept কে প্রধান নৈয়ায়িক মনন বলে—সেনসেশান, পারসেপশান, আইডিয়া, ইমাজিনেশান প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ গুণগতভাবে নতুন ও উন্নততর স্তর বলে মনে করা হয়েছে। বড় কথা—মনের বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী শক্তিকে জ্ঞানের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছে এবং মনের "সক্রিয় ভূমিকা' স্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিয়ে কেউ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে—প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষে যোগদান করতে পারে, প্রতীতি-সমূহকে এমন-ভাবে পরিকল্পিত করতে পারে যাতে প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি বাড়ে অথবা প্রগতিশীলতার গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। আসল কথা বস্তুবাদী হওয়া মানে—মনকে যন্ত্রে পরিণত করা নয়, নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় ফেলে রাখা নয়। বস্তুবাদী কল্পনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং করেন এই অর্থেই যে মন জগতের দেওয়া অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে এমন বস্তু নির্মাণ করতে পারে যা বাহ্যতঃ দেখতে অপূর্ব বটে, কিন্তু আসলে জাগতিক অভিজ্ঞতারই রকমফের। মার্কসীয় দর্শন ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতাকে (হিসটোরিকাল নেসেসিটি) গুরুত্ব দিয়েছে একথা যত সত্য, তত সত্য এই কথাটিও যে মানসিক স্বাধীনতাকেও (হিউম্যান ফ্রিডম) সমানভাবে স্বীকার করেছে। ভি একানাসিয়েভ তাঁর মার্কসীয় দর্শনে এ বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য "practical experience has conclusively shown that by understanding objective necessity, people subordinates to their will not only the law of nature, as

witnessed by the achievements of modern science and technology but also the course of social events. It is knowledge of objcetive necessity and its employment in the interest of man that constitute human freedom"—(পৃষ্ঠা ১৮৩)। এই যে জাগতিক অভিজ্ঞতাকে ইচ্ছার অধীন করবার এবং ইচ্ছাপূর্বক অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করবার ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা থেকে নতুনতর—বাস্তব সম্ভাবনাকে (real possibility) এবং অবাস্তব সম্ভাবনাকে (abstract possibility) ধারণা করবার ক্ষমতা, এ কিছুতেই স্বীকৃত হত না যদি না মনকে সক্রিয় ও স্বাধীন বলে গণ্য করা না হত। ভাববাদীদের দ্বারা স্বীকৃত স্বাধীনতার সঙ্গে এই স্বাধীনতার পার্থক্য এখানেই যে ভাববাদীরা মানস-ক্রিয়া পদ্ধতিকে ব্যক্তিপ্রীতিনিরপেক্ষ বলে মনে করেন এবং বস্তুবাদীরা মনন পদ্ধতিকে (ক্যাটিগোরিগুলিকে) বাস্তব অভিজ্ঞতাজনিত বলে—বস্তুজ্ঞানসাপেক্ষ বলে মনে করেন। এই ধরনের দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এ দিকে আর অগ্রসর হতে চাইনে, তবে অন্যদিকে যাওয়ার আগে শুধু এই কথাটিই মনে রাখতে বলছি যে, কল্পনাবাদ মনের গ্রহণ-বর্জন সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ সংযোগ বিয়োগ উদ্‌ভাবন প্রভৃতি ক্ষমতার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ জাগতিক অভিজ্ঞতাকে খেয়ালমতো সাজানো-গোছানোর কাটছাঁট করার একের সঙ্গে অপরকে মেলানো মেশানোর, একের দেহে অন্যের বৈশিষ্ট্য আরোপ করার ক্ষমতাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়েছে—এমন কি শূন্যগর্ভ আকার তৈরি করার অর্থাৎ অবস্তুবস্তুকিঞ্চিৎ নির্মাণ করবার শক্তিকে চরম পর্যায় বলে মনে করেছে। এই যে রূপকে বিষয়নিষ্ঠ অভিজ্ঞতাভিত্তিক করে তোলার প্রবৃত্তি এবং রূপকে বিষয়নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতাতিশায়ী রূপজগতের সামগ্রী করে তোলার রূপকে রূপের সীমায় আবদ্ধ করে দেখার বা দেখানোর প্রবৃত্তি—এই দুই প্রবৃত্তি শিল্পতত্বে যথাক্রমে—"রেকায়েনশিয়ালিজিম", যাকে আমরা বলতে পারি বিষয়সাপেক্ষবাদিতা এবং "এ্যাবসোলিউটিজিম" যাকে বলা যেতে পারে, রাহু বিষয়-

নিরপেক্ষবাদিতা এই দুই নামে পরিচিত। রেফারেনশিয়ালিষ্টরা বলতে চান শিল্পে যে রূপটি ইন্দ্রিয় গোচর হয় তা আসলে কোন না কোন রূপবহির্ভূত বিষয়েরই রূপ-তা' refers to something lying outside. অন্যপক্ষে এ্যাবসোলিউটিষ্টরা বলতে চান—শিল্পের রূপ স্বয়ং সম্পূর্ণ, কোন বাহ্য বিষয়ের রূপ নয় রূপাতিরিক্ত কোন কিছুকে সে প্রকাশ করে না। শিল্পে রূপই রূপের শেষ, সে অন্য কিছুর সেতু বা প্রতিনিধি নয়—রূপ "এ্যাবসোলিউট"—পরমার্থ। সাপেক্ষরূপবাদে রূপ পরমার্থ নয়, অন্য অর্থের 'প্রতিপাদক, নিরপেক্ষরূপবাদে রূপই পরমার্থ। সাপেক্ষরূপবাদীদের কাছে, শিল্পে বিষয়বস্তুর প্রকৃতিই রূপ হয়ে উঠে, বিষয়বস্তুই রূপকে নিয়ন্ত্রিত করে; নিরপেক্ষরূপবাদীদের কাছে—শিল্পে বিষয়বস্তু বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই, থাকার মধ্যে আছে একমাত্র রূপ—যে রূপ অনন্যপরতন্ত্র। সাপেক্ষ-রূপবাদে—রূপের মূল্য বিষয়ের অভিব্যক্তির মাত্রার উপরে নির্ভরশীল অর্থাৎ যে পরিমাণে বিষয়বস্তু রূপের মধ্যে অভিব্যক্ত সেই পরিমাণে রূপ বা শিল্পটি সুন্দর নিরপেক্ষবাদে রূপের বিচার রূপাদর্শ দিয়েই সম্ভব, অন্য কোন মানদণ্ড দিয়ে বিচার সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য হলেও, এখানেই একবার বলে নিতে চাই যে শিল্প সমালোচনার মূল সমস্যা এই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এবং এ সমস্যার সমাধানে কোন মধ্যপন্থা নেই। অবশ্য কেউ কেউ মধ্যপন্থা আবিষ্কারে চেষ্টা যে না করেছেন এমন নয়। যেমন লিয়োনার্ড বি, মেয়ার তাঁর সংগীতে আবেগ ও অর্থ ("ইমোশান এ্যাণ্ড মিনিঙ ইন মিউজিক") নামক গ্রন্থে লিখেছেন—"এই দুই পক্ষের অবিরাম বিবাদ সত্বেও এ কথা খুবই স্পষ্ট যে নিরপেক্ষ অর্থ এবং সাপেক্ষ অর্থ পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। একই সংগীতে ঐ দুই অর্থ একই সঙ্গে থাকতে পারে যেমন চিত্রে থাকে কাব্যে থাকে"—(১ম পৃষ্ঠা) তবে একই সঙ্গে দুই অর্থের অবস্থান আর রূপের আদর্শেরই মধ্যে রূপের অর্থ বা মূল্যের সন্ধান এক কথা নয়। তাই বলেছি—সমস্যা সমাধানের কোন মধ্যপন্থা নেই এবং নেই এই কারণেই যে দুটি প্রবৃত্তি আসছে দুটি ভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এ সম্বন্ধে আগে সমাক্তভাবে কয়েকটি কথা বলেছি

এবং এখানেও বলছি, বস্তুনিরপেক্ষ রূপকল্পনার সম্ভাবনা স্বীকার শেষপর্যন্ত ভাববাদে পৌঁছে দেবে—মন ও বস্তুজগতের সম্পর্ক বিষয়ে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। অবশ্য মনের স্বাধীনতা স্বীকার করা আর ভাববাদী হওয়া এক কথা নয়, মনের সক্রিয় ভূমিকা স্বীকার করেও বস্তুবাদী থাকা যায়, এবং থাকা যায় বস্তুজগতের সঙ্গে রূপ ও ধারণার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করেই।

এই তৃতীয় বক্তৃতায় আমি প্রথমে সৃজনশীল কল্পনাবাদের যিনি প্রবল প্রবর্তক বা প্রচারক সেই ক্রোচের প্রতিভানবাদ (ইণ্টুইশন থিয়োরি) সম্বন্ধে এবং বিষয়বস্তু থেকে আরো দূরে সরে যেয়ে যাঁরা "বস্তুশূন্য বস্তুকিঞ্চিৎ" তৈরি করাকেই —'কনফিগারেশান' নির্মাণকেই, শিল্পের উদ্দেশ্য বলে প্রচার করেছেন তাঁদের মত সম্বন্ধে আলোচনা করব। তার আগে আমি মানুষের মনের শক্তি সম্ভাবনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মানুষের বৈশিষ্ট্য যে মননের মধ্যে নিহিত এবং মনন সম্ভব হ'য়েছে মনের স্মরণ, বিশেষ দেশকালের আধার থেকে প্রতীতিকে অন্য আধারে স্থাপন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংশ্লেষণ—বিশ্লেষণ প্রভৃতি ক্ষমতার জন্য এ কথা সুবিদিত এবং বহু প্রচারিত। এ কথাও সকলে স্বীকার করেন—মনন ক্রিয়ার ভিত্তি হচ্ছে প্রাণন ক্রিয়া—আত্মরক্ষার ও আত্মপ্রজননের প্রবৃত্তি রূপে যা আত্মপ্রকাশ করে থাকে। প্রাণেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য চেতনা—পরিবেশের উত্তেজনায় সহজ প্রতিক্রিয়ারূপে যার প্রাথমিক অভিব্যক্তি এবং সংবেদন, প্রতীতি গ্রহণ, প্রতীতির সংশ্লেষণ—বিশ্লেষণ পরিবর্তন, পরিবর্ধন সমযোগসাধন প্রভৃতি ব্যাপার সম্পাদনে এবং প্রতীতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও স্বরূপ নির্ধারণ, এক কথায় সংজ্ঞাকরণে যার ক্রমাভিব্যক্তি ও পরিণতি, সুষুপ্তি, স্বপ্ন জাগরণে যার ত্রিবিধ অবস্থা এবং নির্জ্ঞান, আসংজ্ঞান এবং সজ্ঞান যার বিভিন্ন স্তর। উন্নতমনন-সমর্থ মানুষ বাহ্য জগতকে শুধু প্রতীতিরূপে গ্রহণই করে না, প্রতীতিকে বাসনানুসারে পরিকল্পিতও করতে পারে—এক দেশকালের প্রতীতিকে অন্য দেশকালে স্থানান্তরিত করতে পারে, একাধিক প্রতীতিকে এক কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট করতে পারে ; প্রতীতিকে পরিবর্তিত পরিবর্ধিত

করতে পারে—ইরেজিতে যাকে বলে 'manipulate' করা তাই করতে পারে। মনের এই শক্তিকে প্রাচীনেরা একেবারেই চিনতেন না বা জানতেন না এমন নয়। স্বপ্নের ও দিবাস্বপ্নের রহস্য তাদের মনকেও নাড়া দিয়েছিল, তারা দেখেছিলেন—মন শুধু সম্ভবকেই (real possible) ধারণা করতে পারে না, সম্ভাব্যকেও (probable) এমনকি abstract possible ভাবনা করতে পারে।

স্বপ্নে এবং দিবাস্বপ্নে মন স্বাধীনভাবে অপূর্ণ ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে, দেশকালের বাধা অতিক্রম করতে পারে, নিয়তির নিয়মকে (নেসেসিটি) লঙ্ঘন করতে পারে এমন কি ভবিষ্যতের মধ্যেও নিজেকে সম্প্রসারিত করতে তথা ইচ্ছাকে মুক্তি দিতে পারে। ইতিহাস অনুকরণ করে যা-ঘটেছে তাকেই What has hap, ened, এবং কাব্য অনুকরণ করে যা ঘটতে পারে; শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষকে as they are, যেমনটি দেখা যায় তেমন, রূপে অনুকরণ করেন কেউ কেউ as they ought to be, যেমনটি হওয়া উচিত, রূপে উপস্থাপিত করেন—এরিষ্টটলের এই সব উক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলেই দেখা যাবে—"What has happened"-কে রূপ দিতে মনকে যত বিষয়ানুগত থাকতে হয়, "What may happen"-কে রূপ দিতে ততখানি বিষয়ানুগ থাকতে হয় না। মন সম্ভবের গণ্ডী অতিক্রম করে সম্ভাব্যের গণ্ডীতে প্রবেশ করে সম্ভবকে ইচ্ছার দ্বারা পরিবর্তিত করেছে, সম্ভবের রূপের সঙ্গে নতুন উপাদান যুক্ত করে অথবা রূপ থেকে পুরাতন অংশ বিযুক্ত করে, সম্ভবকে নতুনতর সত্তায় পরিণত করেছে। বলা বাহুল্য সম্ভাব্য রূপের ধ্যান-ধারণা করার সময়ে মন বিশেষের আনুগত্য থেকে অনেক পরিমাণে মুক্ত হয়, অপূর্ব ধারণার বা সম্ভাবনার দিকে অভিযান করে। বৃদ্ধ ফিলোসট্রেটাস তিয়ানার এপোলোনিয়াসের জীবনীগ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করে আমরা দেখাতে পারি মনের স্বাধীনভাবে রূপকল্পনার ক্ষমতা প্রাচীনকালেই স্বীকৃত হয়েছিল।

শিল্পসৃষ্টি যে অনুকরণমাত্র নয় তা প্রমাণ করতে বৃদ্ধ ফিলোসট্রেটাস লিখেছেন —ফিডিয়াস ও প্রাকসিটেলেস্‌ন স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের দেখে দেখে দেবমূর্তি নির্মাণ করেননি। তাঁদের চোখের সামনে কোন আদল বা দেবরূপ না থাকলেও, তাঁরা কল্পনাশক্তিবলে ঐ সব মূর্তি ধারণা করেছিলেন। কল্পনা অনুকরণের চেয়ে অধিকতর স্বাধীন মানসিক ক্রিয়া, অনুকরণ রূপ দিতে পারে তাকেই যা ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়েছে। কল্পনা রূপ দিতে পারে যাকে সে কখনও তাকে দেখেনি। অবশ্য এই রূপের উপাদান সংগ্রহ করে সে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকেই। যত জুপিটার ও মিনার্ভার মূর্তি গঠিত হ'য়েছে, সব হয়েছে কল্পনাবলেই। ফিলোসট্রেটাসের কিছু আগে সিসেরোকে বলতে দেখা যায়—ফিডিয়াস যখন জুপিটার মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন তখন বাস্তব কোন কিছুর অনুকরণ করেননি, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর অন্তর্নিহিত সুন্দর ধ্যানের বা আদর্শটির উপরে এবং ঐ সুন্দরের ধ্যানই তাঁর হাতকে ও কলাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

মনের উদ্ভাবনী শক্তি ও সংকলনী শক্তি আছে এ ধারণা সব দেশেরই মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। নানারূপ রূপ থেকে রূপ সংগ্রহ বা চয়ন করে করে নতুনতর রূপ বা আদর্শরূপ সৃষ্টির ক্ষমতা মনের আছে এ কথা সংস্কৃত সাহিত্যে বহুস্থলে উচ্চারিত হয়েছে। কালিদাসের এই শ্লোকটি একটি সার্থক উদাহরণ।

> চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা
> রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু
> স্ত্রীরত্ন সৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
> ধাতোর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যা ॥

বলাবাহুল্য এখানে "রূপোচ্চয়ন"-এর উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। অনুকরণ থেকে উচ্চয়ন ভিন্ন মানসিক ক্রিয়া। অনুকরণে মন বিষয়ানুবদ্ধ, উচ্চয়নে মন ক্রিয়াশীল গ্রহণ-বর্জন ব্যাপৃত, বিচরণশীল, এক কথায় বিকল্পনাক্ষম। তবে রূপোচ্চয় করে মনে মনে সৃষ্টি করলেও, ঐ অপরা সৃষ্টি স্ত্রীরত্নেরই বপু,

নারীরই আদর্শরূপ ; যে নারী লৌকিক জগতেরই অন্যতম বিশেষ। তিলোত্তমা এক হিসাবে অপরা বা অপূর্ব সৃষ্টি বটে, কিন্তু অন্য হিসাবে পূর্বেরই অনুকরণ, আদর্শ নারীরূপের অনুকরণ। এ পর্যায়েও মন সম্পূর্ণ বিষয়মুক্ত নয় অর্থাৎ অভিজ্ঞাত জগতের বাইরে উৎক্রমণ করে না, অভিজ্ঞাত বস্তুকে আদর্শায়িত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু এই পর্যায়ের উপরে আর একটা পর্যায় দেখা যায় যেখানে মন কোন নৈর্ব্যক্তিক ধারণাকে সাংকেতিক বা বাস্তবিকরূপে বাস্তবায়িত করতে চায়, ভাবনাকে রূপে পর্যবসিত করতে চেষ্টা করে। দেবতার ধ্যানে, রাক্ষস-খোক্কসের কল্পনায়, সাংকেতিক রচনায় মনের এই শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। নির্গুণ পুরুষ এবং গুণময়ী সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী মহাপ্রকৃতির ধারণা শিব-দুর্গা, শিব-মহাকালী প্রভৃতি দেবদেবীর ধ্যানে পরিণত হ'য়েছে ; মহাশক্তির ধারণা দশভূজা দুর্গার মূর্তিতে কল্পিত হ'য়েছে ; সর্বগ্রাসী, সর্বসংগ্রহী মহাশক্তিশালী রাক্ষসের ধারণা দশমুণ্ড দশহাত মায়াবী রাবণের কল্পনায় পর্যবসিত হ'য়েছে, শিল্পীদের সাংকেতিক রচনায় সংকেতগুলি—রবীন্দ্রনাথের জালের আড়ালে রাজার কল্পনা, অন্ধকার ঘরে রাণীর কল্পনা, ইবসেনের বুনো হাঁস, সমুদ্র-তিতির পাখী, সাদা ঘোড়া, ইত্যাদি, মেতার্লিঙ্কের নীল পাখী,—মনের এই বৃত্তি অর্থাৎ ধারণাকে ধ্যানে পর্যবসিত করার শক্তি থেকেই জন্মেছে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে—মানুষ যে মুহূর্তে দিবাস্বপ্ন দেখেছে; মনে মনে মথুরায় যেতে পেরেছে ; প্রতীতিকে স্থানান্তরে, কালান্তরে বিন্যস্ত করতে পেরেছে ; প্রতীতিকে খণ্ডিত, মার্জিত, সংবর্ধিত করতে পেরেছে সেই মুহূর্তেই তার মন নতুন শক্তির অধিকারী হ'য়েছে দেশকালের বন্ধন থেকে অনেকটা মুক্ত হয়েছে, বিষয়ের উপরে আপন আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই ক্ষমতারই বিশেষ পরিভাষা কল্পনা। এই ক্ষমতা বা বৃত্তি প্রতীতির পুনঃস্মরণ নয় অথবা কোন সংজ্ঞাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে পর্যবসিত করা নয়, এ বৃত্তি অপূর্ববস্তু সৃষ্টির ক্ষমতা।

কল্পনাবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকেই চিন্তাশীলরা অবহিত।

এর ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা দেখতে পাই গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিষ্টটল 'ফ্যাণ্টাশিয়া'-কে নিম্নতর একটি মানসিক ক্রিয়া বলে জানতেন, কারণ ফ্যাণ্টাশিয়া মিথ্যার ও মায়ার এবং বুদ্ধি-বিচারের পরিপন্থী আবেগের জনক। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য প্লেটো সাধারণ ফ্যাণ্টাশিয়াকে নিম্নতর মানসিক ক্রিয়া বলে স্বীকার করলেও বুদ্ধি অপেক্ষা উন্নততর একপ্রকার ফ্যাণ্টাশিয়া-দিব্যদৃষ্টির অধিকারী মানসিক বৃত্তিকেও লক্ষ্য করেছিলেন (টাইমুস সংলাপ দ্রষ্টব্য)। এরিষ্টটল তার 'ডি এনিমা'তে অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার (সংবেদন, প্রতীতি (ওপিনিয়ন) স্মরণ, বুদ্ধি) সঙ্গে ফ্যাণ্টাশিয়াকেও স্থান দিয়েছেন এবং তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। প্লেটো-এরিষ্টটলের ধারণা বা মনোভাবই পরবর্তীকালের স্টোয়িক ও নব্যপ্লেটোবাদীদের চিন্তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে।

লঙ্গাইনাস এবং কুইন্টিলিয়ান ফ্যাণ্টাশিয়াকে আবেগের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে করেছেন এবং এই কথা বলতে চেয়েছেন যে ফ্যাণ্টাশিয়াই "এনারগেইয়া" (energeia) চোখের সামনে স্পষ্ট রূপ উপস্থাপন করবার ক্ষমতার অধিকারী। নব্যপ্লেটোবাদী প্লটাইনাস, আয়াম্‌বিলিকাস্‌ সাইনেসিয়াস্‌ প্রমুখ ফ্যাণ্টাশিয়াকে নিম্নতর মানসিক বৃত্তি বলে হেয় জ্ঞান করলেও প্লেটোর টাইমুস সংলাপের প্রভাবে উন্নততর ফ্যাণ্টাশিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার এবং দিব্যদৃষ্টির বা অতীন্দ্রিয় কল্পনার পথ প্রশস্ততর করেছিলেন। লাতিনে ফ্যাণ্টাশিয়ার প্রতিশব্দ হল 'ইমাজিনেশিয়ো' এবং সমগ্র মধ্যযুগে দুটি শব্দ সমার্থক ছিল। পরে যখন অর্থ পৃথক হ'ল—ইমাজিনেশিয়ো বলতে বুঝালো—গৃহীত প্রতীতির পুনরুদ্‌বোধন এবং ফ্যাণ্টাশিয়া বলতে, সংযোজক ও স্বজনক্ষম শক্তি। এর পর যখন মনোবৃত্তির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ পরিকল্পিত হল—কল্পনাকে স্থাপনা করা হ'ল মস্তিষ্কের প্রথম কক্ষে অন্য দুই কক্ষে থাকল—বুদ্ধি ও স্মৃতি। অবশ্য—টাইমুস সংলাপ—প্রচারিত অতীন্দ্রিয় কল্পনার ধারণা (সুপ্রাসেন্‌সিবিল

ইমাজিনেশান) একেবারে লোপ পায়নি , অগাষ্টাইন, বোনাভেন্টুরা প্রভৃতির মধ্যে এই ধারণার ধারাটি লক্ষ্য করা যায়।

রেণেশাঁস-মনস্তত্ত্ব মধ্যযুগের ধারণাকে উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছিল। কল্পনাকে বুদ্ধির চেয়ে হেয় বৃত্তি বলে গ্রহণ করেছিল। অতীতের সংস্কার যেমন এর মূলে ছিল, তেমনি ছিল আর একটি কারণ এবং সেই কারণটি এই যে পেরাশেইসাস ও অন্যান্যরা যাদুশক্তিকে কল্পনার দান বলে প্রচার করেছিলেন। কল্পনাকে এই কারণে ভয়ের দৃষ্টিতে দেখা হতে লাগল। শিল্পের সঙ্গে কল্পনার যোগ রয়েছে, দুচার জনের মধ্যে এ চিন্তা পাওয়া না গিয়েছিল এমন নয়। ম্যাজোনি (ডিফেসা—১৫৭২-৮৭) ট্যাসো, সিডনি, প্রমুখরা কল্পনার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ফ্রেকাসস্তোরো'র মধ্যে দেখা যায়—তিনি ফ্যানসিকে স্মরণ-বৃত্তিতে এবং কল্পনাকে সমন্বয়-সাধিকা বৃত্তিতে পরিণত করেছেন। রোঁসাদ, পুত্তেনহাম এবং সিডনে ইমাজিনেটিভ এবং ফ্যাণ্টাসটিকাল' এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা এবং কবি কল্পনাকে উদ্ভাবনী শক্তিরই নামান্তর বলে মনে করেছিলেন। কবির মধ্যে কল্পনা বৃত্তির আধিক্য থাকে, হিবার্টে (১৫৭৫) এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন এবং বেকনও কল্পনার সংশ্লেষণী শক্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দী কল্পনা বিষয়ে সুস্থ চিন্তা করার পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। একদিকে ডেকার্তে, গসোন্তি মেলব্রান্‌ক প্রভৃতির বুদ্ধিবাদ-আসক্তি, অন্যদিকে হব্‌স প্রভৃতির বস্তুবাদ ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব। বুদ্ধিবাদীরা কল্পনাকে অযৌক্তিক ক্রিয়া, সুতরাং অশুভঙ্কর ব'লে প্রচার করেছিলেন, বস্তুবাদীরা যেমন হবস তাঁর লেভিয়াথান (১৬৫১) গ্রন্থে—কল্পনাকে "Decaying sense" (ক্ষীয়মান) ইন্দ্রিয় ?) বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। যদিও শিল্পসৃষ্টিতে বুদ্ধি ও কল্পনা দু'ই আবশ্যক তবু ড্রাইডেন খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন—কল্পনাই সৃষ্টিকে জীবন্ত করে তোলে। মোটকথা কল্পনার স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা তখনও গড়ে ওঠেনি। ইমাজিনেশান, উইট, ফিন্সি—প্রভৃতি শব্দ সমার্থক বলেই গণ্য হ'য়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি কল্পনার স্বাধীনতা বুদ্ধিবাদ ও বস্তুবাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। এই শতাব্দীর মনস্তত্ত্বচিন্তা—হিউম হেলভিতিয়াস কোন্ডিলাক প্রভৃতির কল্পনার পক্ষে অনুকূল ছিল না। এ্যাডিসন তাঁর 'কল্পনার আনন্দ' (১৭১২) প্রবন্ধাবলীতে ভাবানুষঙ্গবাদী মনস্তত্ত্বের পটভূমিতে কল্পনাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন। গেরার্ড (১৭৫৯) কেম্‌স্ (১৭৬২) এলিসন (১৭৯০) প্রভৃতি 'রুচি' (টেষ্ট) নিয়ে যে সব আলোচনা করেছিলেন তাতে এডিসনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে কল্পনা নিয়ে প্রশংসনীয় আলোচনা হয়েছিল—ইতালীতে এবং পরে জার্মানীতে। মুরাতোরি (১৭০৬) ও কোন্তি (১৭৪৮) ফ্যাণ্টাশিয়া ও 'ফ্যাণ্টাসমি' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। ইতালীর জামবাত্তিস্তা ভিকো জার্মানীর আলেকজাণ্ডার বোমগার্টেন, সুইজারল্যাণ্ডের বোড্‌মের ও ব্রেইটিঙ্গের (১৭৪০) কল্পনার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু কেউই বুদ্ধিবাদের আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি, কল্পনাকে স্বাধীন বৃত্তির মর্যাদা দেননি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের মধ্যেও আমরা বুদ্ধিবাদের ও আবেগবাদের পিছুটান দেখতে পাই। কল্পনা যে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ মেনে না চললে অনাসৃষ্টি ঘটায় এ কথা কাণ্ট স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি লিখছেন—"কল্পনাকে বুদ্ধির নিয়ম মেনেই স্বাধীনতা ভোগ করতে হবে, কারণ নিয়মরহিত স্বাধীনতার কল্পনা, সব সম্পদের অধিকারী হয়েও, অনাসৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।" (১৮৩ পৃষ্ঠা) এতেই বুঝা যায় কাণ্ট কল্পনার বুদ্ধিনিরপেক্ষ সৃজনক্ষমতায় আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। তারপর জাজমেণ্টকে —যার বাংলানুবাদ করা হয়েছে—"রসবিচার" (শ্রীরাসবিহারী দাস মহাশয়ের 'কাণ্টের দর্শন' দ্রষ্টব্য)—আনন্দ বেদনাত্মক অনুভূতি-বৃত্তি বিষয়ক (Mental faculty) জ্ঞানাত্মিকা শক্তি (cognitive faculty) বলে মনে করায় এবং বৃত্তির তালিকায় কল্পনার কোন স্থান না থাকায় এই কথাই মনে হয়—সৃজনী-

শক্তি প্রতিভার ও বিচার-বৃত্তি রুচির সঙ্গে অনুভূতির সম্পর্কটি কি কাণ্টের লেখা থেকে তা সহজে বুঝতে পারা যায় না। সে যাই হোক, কাণ্টের চিন্তায় বুদ্ধিবাদের প্রধান্য রয়েছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কাণ্ট এস্থেটিক আইডিয়া বলতে গিয়ে —"representation of the imagination বুঝেছেন এবং কল্পনাকে বলেছেন—productive faculty of cognition— "p›werful agent for creating, as it were a second nature out of the material supplied to it by actual nature".

কিন্তু যে কথা আগেই বলেছি তাঁর ধারণায় "the aesthetic idea is a representation of the imagination annexed to a given concept ....." এবং প্রতিভা কল্পনা ও বুদ্ধির সংযোগের ফল। (১৭৯ পৃঃ)

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই আমরা পাই এমন কয়েকজন ভাববাদী জার্মান দার্শনিক যাদের চিন্তা, রোমান্টিক মতবাদের প্রাণস্বরূপ "অর্গানিক ফর্ম"-এর ধারণা জন্ম দান করেছিল এবং নানা দেশের কবি দার্শনিকদের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। আমরা দেখতে পাই—কণ্টের মধ্যেই প্রতিভার অন্যতম উপাদান হিসাবে Geist Soul স্বীকৃত হয়েছে এবং "Geist" বলতে কাণ্ট বুঝেছেন—"The animating principle in the mind"। জার্মান দার্শনিক শেলিঙ তাঁর ট্র্যানসেনডেনটাল আইডিয়ালিজম (১৮০৪) গ্রন্থে এবং প্রকৃতির সঙ্গে মূর্তি শিল্পের সম্পর্ক—নামক বক্তৃতায় (১৯০৭) একধাপ এগিয়ে গিয়ে বিশ্বের মূলীভূত চিরন্তন সৃজনী শক্তির কল্পনা করলেন এবং শিল্পকর্মকে পারমার্থিক সত্তারই দৃশ্যরূপ বলে ঘোষণা করলেন। এই রূপ সম্ভূত বস্তুর অনুকরণ থেকে পৃথক, এবং—শিল্প সৃষ্টি হল—"a holy eternally creative elemental power of the world which generates all things out of itself and brings them forth productive" বিশ্বের মূলে একটা সদা সৃজনশীল আদিম শক্তি রয়েছে; এই শক্তি নিজের ভিতর থেকেই সব কিছু সৃষ্টি করছে এবং সব কিছুকে সফল করে তুলছে। এই শক্তি

বস্তু-প্রকৃতি রূপে এবং আত্মা রূপে অভিব্যক্ত রয়েছে। বস্তুর এবং চৈতন্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা আপাত পার্থক্য, বস্তু চৈতন্যেরই আত্মপ্রকাশের উপায় বিশেষ। মহাশক্তি বস্তুরাজির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে তার পরম ঐক্য ও সমন্বয়কে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করার জন্যই। অন্য সব প্রাণীকে প্রকৃতিই চালিত করছে, চৈতন্য সেখানে অনুপস্থিত। একমাত্র মানুষের মধ্যেই চৈতন্য ব্যক্তরূপে বর্তমান। চৈতন্য বা আত্মা হল প্রকৃতিরাজ্যে সূর্য। সূর্য যেমন জগতকে আলোকিত করে, চৈতন্যও তেমনি প্রকৃতিকে আলোকিত করে—প্রকাশিত করে। তাই শুধু মানুষেরই আছে—স্বরূপ দর্শনের ক্ষমতা বা দৃষ্টি, আপাত রূপের অন্তরালে যে "স্বভাব" (এসেন্স) থাকে সেই স্বভাবকে দেখার শক্তি। এই দেখা শুধু সংজ্ঞান চিত্তের কাজ নয়, এই দেখায় সংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান চিত্তের উভয় স্তরই অংশ গ্রহণ করে। ভাব ও রূপের এমন একাত্মতা স্থাপিত হয় যে ভাব থেকে রূপকে, রূপ থেকে ভাবকে পৃথক করা যায় না। শেলিঙ বললেন—"**Art springs from the vivid movement of the innermost energies of the mind and spirit which we term inspiration**"। তাঁর মতে শিল্প হল—"**vision and expression of indwelling spirit of nature.**"

'**Animating spirit**' '**creative clemental power**' এবং **i**ı.**spiration** বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপের মধ্যে অঙ্গলাভ করছে, রূপে রূপে নিজেকে ব্যক্ত করছে, মানুষের মধ্যে এসে প্রকাশ শক্তির রূপ ধরে বিশ্বকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে—কবি দার্শনিকদের মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল এবং কল্পনার সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টায় নতুন শক্তি সঞ্চার করেছিল। কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী প্রভৃতি রোমান্টিক কবিরা অদম্য আবেগে কল্পনার মহিমাকে প্রচার করেছিলেন। শেলিঙের মত অনুসরণ করেই কোলরিজ শিল্পকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দুই সত্তার—দেহ ও আত্মার সমন্বয় রূপে গণ্য করেছিলেন এবং এই কথাই বলেছিলেন যে এই সমন্বয় ঘটাতে পারেন তিনিই

যিনি সংজ্ঞান ও নিৰ্জ্ঞানকে মেলাতে পারেন। তাঁর কাছে যিনি সংজ্ঞান নির্জ্ঞানকে মেলাতে পাবেন তিনিই প্রতিভাবান। এর জন্ত চাই কল্পনাশক্তি —যা' সব কিছুকে মিলিয়ে মিশিয়ে গলিয়ে অপূর্ব কিছু সৃষ্টি করে। এই ব্যাপারে নির্জ্ঞান মনের কাজ থাকে অনেকখানি এবং ভাবাবেগের যোগ অপরিহার্য। কোলরিজেব ধারণা—শিল্পের রূপ শিল্পীর ভাবাবেগের প্রকৃতির বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে—পরিস্থিতির (সিচুয়েশান) মধ্যে নিহিত থাকে। এই পরিস্থিতির উপলব্ধিই রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্পসৃষ্টি পরিস্থিতির জন্ত সর্বতোভাবে উপযোগী রূপ বা সংকেত সৃষ্টি করা। প্রতিভা—যাকে বলা হয়েছে—the shaping power of imagination পরিস্থিতিকে বাঁধাধরা রূপের আধারে প্রকাশ করার চেষ্টাকে বাধা দেয় এবং দেয় এই বিশ্বাসেই যে অপূর্ব কোন আবেগ বা প্রতিভানে প্রচলিত রূপ আরোপ করার ফল হয় অনুভূতির আন্তরিকতাশূন্ততা ও রূপের কৃত্রিমতা। কোলরিজ কল্পনাকে—বিশ্বের মূলীভূত সৃজনী-বৃত্তিরই অংশ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তিনি কল্পনাবৃত্তির মধ্যে তিনটি পর্যায় কল্পনা করেছেন অর্থাৎ কল্পনাকে প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী এবং ফ্যানসি এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, তাঁর কাছে প্রাথমিক কল্পনাই যথার্থ কল্পনা—এবং তা হচ্ছে "the repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I AM"। সৃষ্টি হচ্ছে অসীমের আত্ম-অভিব্যক্তি—বিষয়-বিষয়ীর একাত্মভাব। কল্পনাবলে মানুষ সীমার গণ্ডীতে চিরন্তন সৃষ্টিলীলার পুনরাবৃত্তি করে থাকে। মোট কথা এই যে, ভাববাদী রোমান্টিক কবি দার্শনিকরা কল্পনাবৃত্তির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির ও অনুভববৃত্তির সঙ্গে কল্পনাবৃত্তির সম্পর্ক কি তা ঠিকভাবে নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেননি। আমরা দেখেছি কান্ট শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারে কল্পনার স্বাধীনতা বিপত্তিকর বলে মনে করেছেন এবং রোমান্টিক কবি ও ভাববাদী দার্শনিকদের অনেকেই কল্পনাকে অনুভব-বৃত্তিরই এক বিশেষ অভিব্যক্তি বলে মনে করেছেন।

ইতালীয় দার্শনিক বেনেডেট্টো ক্রোচে শিল্পতত্ত্বের চিন্তায় এক নতুন অধ্যায় যোজনা করলেন তাঁর বহুখ্যাত "লা' এস্তেতিকা" গ্রন্থে (১৯০২)। তিনি পূর্ববর্তী চিন্তাগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে কল্পনাবৃত্তির স্বরূপ কেউই ধরতে পারেননি; কেউ কল্পনাকে বুদ্ধি সাপেক্ষ, কেউ বা অনুভবসাপেক্ষ বলে মনে করেছেন এবং উভয়েই ভুল করেছেন, কল্পনা যে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র একটি জ্ঞানবৃত্তি তা ধরতে পারেন নি। ক্রোচে বুদ্ধিবাদের ও অনুভববাদের অধীনতা থেকে কল্পনাকে মুক্ত করতে গিয়ে ভাববাদী দর্শনের ভিত্তির উপরে প্রতিভান-বাদের (ইণ্টুইশান থিয়োরি) প্রতিষ্ঠা করলেন।

আগেই বলেছি ক্রোচে ভাববাদী দার্শনিক। তাঁর কাছে, আত্মা (স্পিরিট) ছাড়া আর যা কিছু সবই অসৎ এবং তারই অপর নাম 'প্রকৃতি' (ম্যাটার)। ম্যাটার বলতে তিনি তাকেই বোঝেন যা আত্মাকে আচ্ছন্ন করে, যা 'the spirit suffers' ক্রিয়া বলতেই আত্মিক ক্রিয়া এবং তা' দু'প্রকার—এক জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া, দুই কর্মাত্মিকা ক্রিয়া। জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া আবার দু'রকম—প্রাতিভানিক জ্ঞান ও নৈয়ায়িক জ্ঞান, কর্মাত্মিক ক্রিয়াও দু'রকম—এক আর্থনৈতিক বা প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া, দুই—নৈতিক বা নিবৃত্তিমূলক ক্রিয়া। ক্রোচে আত্মিক ক্রিয়ার এই ভিত্তির উপরে তাঁর দর্শনকে স্থাপিত করেছেন, এবং প্রাতিভানিক ক্রিয়ার ভিত্তির উপরে শিল্পদর্শন গড়ে তুলেছেন। তাঁর মতে, শিল্প হল প্রাতিভানিক জ্ঞান এবং যেহেতু প্রাতিভানিক জ্ঞান নৈয়ায়িক জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, নৈয়ায়িক জ্ঞান নিরপেক্ষ এবং জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়াবিশেষ শিল্পের জগৎ একদিকে নৈয়ায়িক জ্ঞানোৎপন্ন সংস্কার বা সত্যের জগৎ থেকে, অন্যদিকে কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার ফল উপযোগ ও নীতির জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রাতিভানিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"প্রাতিভানিক জ্ঞান হচ্ছে কল্পনার মাধ্যমে পাওয়া বিশেষের জ্ঞান—বিশেষ বস্তুর জ্ঞান প্রতিরূপের স্রষ্টা। অন্যপক্ষে নৈয়ায়িক জ্ঞান হ'চ্ছে—বুদ্ধির সাহায্যে পাওয়া জ্ঞান, সামান্যের জ্ঞান ও বস্তুর পারস্পরিক

সম্পর্কের জ্ঞান—সংজ্ঞার স্রষ্টা। এই দুই জ্ঞানের সম্পর্ক এই যে প্রথমটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, দ্বিতীয়টি সাপেক্ষ, প্রতিভানের উপরে নির্ভরশীল। প্রাতিভানিক জ্ঞানের অভিভাবকের প্রয়োজন নেই, কারো উপরে তাকে নির্ভর করতে হয় না, কারো চোখ ধার করে তাকে দেখতে হয় না, তার নিজেরই সুন্দর দৃষ্টিশক্তি আছে।" বলা বাহুল্য এই কথাগুলি লেখার সময়ে ক্রোচে কাণ্টের মন্তব্যের দিকেই দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং তাকেই সমালোচনা করেছিলেন। এইভাবে ক্রোচে প্রাতিভানিক ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছেন এবং ক্রিয়াকে জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা এই তিন শ্রেণীতে ভাগ না করে—মোট চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন কল্পনাবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া এবং নৈতিক ক্রিয়া। ক্রোচের আগে যাঁরা কল্পনাকে স্বীকার করেছেন তাঁরা কল্পনাকে কোন বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করবেন তা বুঝতে পারেননি। কাণ্ট কল্পনাকে জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া বলে ঘোষণা করেছেন বটে কিন্তু জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা এই তিন বৃত্তির কোনটির কক্ষে কল্পনাকে স্থান দিয়েছেন তা অনুধাবন করতে গেলে দেখা যাবে, "জাজমেণ্ট"কে তিনি 'ফিলিঙ' রূপ মানসিক বৃত্তির জ্ঞান পর্যায়ের ক্রিয়া বলে মনে করেছেন। ক্রোচে খুব স্পষ্টভাবেই কল্পনাকে জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে গণ্য করেছেন এবং একদিকে সংবেদন (সেনসেশান), অনুসংগমন (এ্যাসোসিয়েশান), যৌগিক সংবেদন (রিপ্রেজেণ্টেশান) প্রভৃতি অনাত্মিক ক্রিয়া থেকে, অন্যদিকে নৈয়ায়িক ও কর্মাত্মিকা ক্রিয়া থেকে কল্পনাকে পৃথক করেছেন তথা কল্পনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বৃত্তির মর্যাদা দিয়েছেন। এর অনিবার্য অনুসিদ্ধান্তের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কল্পনাবৃত্তি যদি মানুষের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন একটি বৃত্তি হয় তা হ'লে মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই এই বৃত্তির চাহিদা পূরণ করার একটা সহজ আবেগ থাকবেই—মানুষ কল্পনা করতে এবং কল্পনা উপভোগের মাধ্যমে কল্পনা-বৃত্তি চরিতার্থ করতে চেষ্টা করবেই। এই চেষ্টা থেকেই শিল্পের জন্ম এবং কল্পনা-

বৃত্তি চরিতার্থ হওয়ার আনন্দই শৈল্পিক আনন্দ। দ্বিতীয়তঃ কল্পনা যেহেতু স্বাধীন বৃত্তি, যে বৃত্তি সংজ্ঞা তৈরী করে সেই বুদ্ধিবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র বৃত্তি, কোন 'সত্য'কে আবিষ্কার বা প্রকাশ করা শিল্পের উদ্দেশ্য হতে পারে না শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রতিরূপ সৃষ্টি। তৃতীয়তঃ কল্পনা যেহেতু কর্মাত্মিকা ক্রিয়া নয়, কল্পনা আমাদের বাসনা কামনা বা উপযোগ মেটায় না, আমাদের নীতিবোধকেও তৃপ্ত করে না ; অর্থাৎ শিল্পের সঙ্গে সত্যের বা উপযোগের বা নীতির কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই, শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য শিল্পই—অর্থাৎ রূপকল্প সৃষ্টি এবং তাতেই শিল্পের সার্থকতা। চতুর্থতঃ শিল্প যদি হয় প্রতিভান এবং প্রতিভান বলতে যদি বুঝায় আত্মার গহনে অবস্থিত প্রত্যয়রাজিকে রূপায়িত করা —আকার দেওয়া, কোন্ প্রতীতি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা তা'র বিচারে প্রবৃত্ত না হ'য়ে শুধু রূপের ধ্যান করা, তা'হলে শিল্পবিচারে—অর্থাৎ কল্পনার মূল্য বিচারে—কল্পনার মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোন মানদণ্ড ব্যবহার করলে ভুল করা হবে। কল্পনার সঙ্গে যদি সত্যের কোন সম্পর্ক না থাকে, কল্পনা কোন্ সত্যকে প্রকাশ করছে এবং ঠিকভাবে তাকে প্রকাশ করতে পেরেছে কিনা এ প্রশ্ন তোলা যায় না। উপযোগ এবং নীতি সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য অর্থাৎ শিল্প বিচারে উপযোগের প্রশ্ন এবং নীতির প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। এই দিক থেকে দেখলে অর্থাৎ প্রতিভান-কালে আমরা যদি বাহ্য জগতের সঙ্গে বুঝাপড়া না করি, কেবলমাত্র আমাদের প্রত্যয়সমূহকে (ইম্প্রেশানস) রূপায়িত করতে চেষ্টা করি তা' হ'লে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হবে যে রূপকল্পনা ছাড়া শিল্পের আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না—শিল্পের আদিতে এবং অন্তে—একমাত্র রূপ এবং রূপেই রূপের শেষ।

কিন্তু এই রূপ কি বস্তুশূন্য কিছু ? জ্যামিতিক ক্ষেত্রের মতো নৈর্ব্যক্তিক নির্মিতিমাত্র ? না তা' নয়। কারণ ক্রোচে স্বীকার করেছেন—"প্রকৃতি (ম্যাটার) আকার দ্বারা পরিচ্ছন্ন এবং বিজিত হয়েই নির্দিষ্ট বা বিশেষ রূপে পরিণত হয়। প্রকৃতিই অর্থাৎ বিষয়বস্তুই এক প্রতিভান থেকে অন্য প্রতিভানকে পৃথক করে থাকে······প্রকৃতি (ম্যাটার) না থাকলে আত্মিক ক্রিয়া কিছুতেই তার নৈর্ব্যক্তিকতা

পরিহার করতে পারত না—নির্দিষ্ট ও যথার্থ ক্রিয়ায় পরিণত হতে, নানা আত্মিক ক্রিয়ার রূপ পরিগ্রহ করতে, নির্দিষ্ট প্রতিভান হ'তে পারত না।" এই উক্তি থেকে এই প্রমাণই পাওয়া যায় যে রূপের প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হয়। কিন্তু ক্রোচে বিষয়বস্তুকে এতখানি মর্যাদা দিতে চান নি। বস্তু ও আকারের মধ্যে বিষয়বস্তু ও রূপের মধ্যে সম্বন্ধ কি এই প্রশ্নটি যে শিল্পতত্ত্বের অন্যতম বিসংবাদিত প্রশ্ন ক্রোচে তা' স্বীকার করেছেন এবং এই সম্বন্ধ নিরূপণের প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে শিল্প নিছক বিষয়বস্তু নয় অথবা বিষয় ও আকারের সংযোগও (impressions plus expression) নয়, শিল্পকর্মে প্রত্যয়রাজি রূপরচয়িত্রী বৃত্তির দ্বারা রূপায়িত ও পরিবর্ধিত হয় এবং তা' হয় বলেই—The aesthetic fact...is form and nothing but form"—শৈল্পিক বস্তু আসলে রূপ এবং রূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ কথা শুনে মনে হ'তে পারে যে ক্রোচে বস্তুনিরপেক্ষ রূপের দিকেই ঝোঁক দিয়েছেন এবং এই মনে হওয়া একেবারে অহেতুক নয়। আত্মিক ক্রিয়া প্রত্যয় নির্ভর হয়েও প্রত্যয়াতিশায়ী এবং অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম। আত্মার স্বভাবে যে রূপ-সংস্কার নিহিত আছে আত্মা সেই সংস্কার দিয়েই—প্রত্যয়-সমূহকে (ইম্প্রেশানস্) এমন রূপে রূপায়িত করে, যে রূপের কোন বাস্তব অনুকল্প নেই যে রূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অপূর্বরূপ।

শিল্প যে রূপ সৃষ্টি করে তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, বস্তুসদৃশ হয়েও যা 'অবস্তুবস্তুকিঞ্চিৎ'—অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তু থেকে যা ভিন্ন—এই মত মেনে নিলে শিল্প-সমালোচনায় নিরপেক্ষবাদ (এ্যাবসোলিউটিজিম) গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না এবং এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে হয়—"প্রত্যেক শিল্পকর্মকে শিল্পের নিজ রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বিচার করতে হবে এবং শিল্পের মধ্যেই শিল্পের আদর্শটি নিহিত থাকে। (every art can be judged only in itself and that it has its model in itself) সৌন্দর্যের কোন বাস্তব আদর্শ নেই—হোক না কেন তা' যৌক্তিক সংজ্ঞা অথবা অতীন্দ্রিয় লোকে বিরাজমান বা দোদুল্যমান ভাব (আইডিয়া)। শিল্প যে বৃত্তির সৃষ্টি সেই বৃত্তি দিয়েই

বিচার করতে হবে এবং তাকে কল্পনার আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আদর্শকে মানদণ্ড করা চলবে না। এ বিষয়ে ক্রোচের সিদ্ধান্ত এই যে—শিল্প বিচার সমস্যার—"The true solution lies in rejecting alike relativism and psychologism and false absolu tism and recognising that the criterion of taste is absolute but absolute in a different way from that of the intellect which expresses itself in raticcination. The criterion of taste is alsolute with the intuitive absoluteness of imagination."—সত্য সমাধান রয়েছে সাপেক্ষবাদ, মনস্তত্ত্ববাদ এবং মিথ্যা নিরপেক্ষবাদকে পরিত্যাগ করার মধ্যে এবং এই সত্যকেই উপলব্ধি করার মধ্যে যে রুচির মান নিরপেক্ষ বটে তবে বুদ্ধির মান যে ভাবে নিরপেক্ষ সে ভাবে নয়, বুদ্ধির মান নির্ণয়ের ভিত্তি হচ্ছে—যুক্তি বিচার, অন্যপক্ষে রুচির মান বা আদর্শ নিরপেক্ষ সেইভাবেই যেভাবে কল্পনার মান নিরপেক্ষ এবং কল্পনার সেই আদর্শ প্রতিভান লব্ধ। ক্রোচে আক্ষেপ-আক্রোশ প্রকাশ করে লিখছেন—"আমরা বুদ্ধির ক্ষেত্রে নীতির ক্ষেত্রে আদর্শ বা পরম মান স্বীকার করতে উৎসাহী, কিন্তু কল্পনার ক্ষেত্রে তা' স্বীকার করতে চাইনে। অথচ কল্পনার পরমতা আমরা যদি না মানি আত্মার অস্তিত্বের ভিত্তিই ধ্বসে যাবে—একজন আর একজনের কথা বুঝতে পারবে না, এমন কি তার আগেকার মুহূর্ত্তের সত্তাটিকেও চিনতে পারবে না।"

যদি কেউ ক্রোচেকে প্রশ্ন করেন—তবে বিচারে ভিন্ন মত হয় কেন? ক্রোচে সঙ্গে সঙ্গে বলবেন—হ্যাঁ এ কথা ঠিক শৈল্পিক মূল্যায়নে পার্থক্য দেখা যায় কিন্তু কোথায় মত পার্থক্য নেই? তাই ব'লে নৈয়ায়িক, নৈতিক, আর্থনৈতিক মূল্যায়ন থেকে কেউ বিরত হয় না।

নিশ্চয়ই আপনারা কল্পনার পরম আদর্শ যা আমাদের অন্তরে নিহিত এবং একমাত্র প্রতিভানসংবেদ্য—এমন একটি আদর্শের ধারণা করতে অস্বস্তি বোধ করছেন এবং শিল্প-সমালোচনায় বাস্তব কোন আশ্রয় না পেয়ে নিরাশ্রয়ের হতাশা বোধ করছেন। এই অস্বস্তি থেকে প্রতিভানবাদী সমালোচকের নিষ্কৃতি নেই।

আত্মিক ক্রিয়া'র সার্বজনীনতা স্বীকারের ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি বৃত্তির বা ক্রিয়ার পরম প্রকাশের বা পরাকাষ্ঠা রূপ আত্মার মধ্যেই নিহিত রয়েছে—এই ধারণা পোষণ করে ক্রোচে শেষ পর্যন্ত ভাববাদী দার্শনিকদের মতোই কতকগুলি অভিজ্ঞতা-অনুপলব্ধ (আ প্রিয়োরাই) মনোনিহিত আদর্শ (আরকিটাইপস্) মেনে নিয়েছেন। ফলে ক্রোচের শিল্পসমালোচনা পদ্ধতিতে বুদ্ধি বিচারের স্থান গৌণ হয়ে গিয়েছে—কল্পনার আদর্শ বড় স্থান অধিকার করেছে। ক্রোচের মতে শিল্প-সমালোচনা হচ্ছে শিল্পীর ধ্যানটিকে মনের মধ্যে পুনরুদবোধিত বা পুনরূপ-স্থাপিত করা এবং রূপাদর্শের মানদণ্ডে রূপটির বা ধ্যানটির পূর্ণতা পরিমাপ করা। এখানে প্রথম সমস্যা এই যে শিল্পীর মনে কী ধ্যান জেগেছিল—কি রূপ প্রতিভাত হয়েছিল তা' সমালোচকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ যে প্রতিভান সমালোচকের মনে ফুটে উঠে তার মূল্য প্রতিভান লব্ধ রূপাদর্শের মানদণ্ডে ছাড়া নির্ণয় করার অন্য কোন উপায় নেই। মোট কথা এই যে প্রতিভানবাদীরা—নিরপেক্ষবাদী এবং সেই সেই কারণেই রূপবিচারে রূপের আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আদর্শ প্রয়োগ করতে পারেন না। আর ঐ রূপের আদর্শ যেহেতু প্রতিভানবেদ্য প্রতিভানবাদী সমালোচনা আত্মনিষ্ঠ হতে বাধ্য।

রূপকে একমাত্র রূপের আদর্শ বা মানদণ্ডে বিচার করতে গেলে বিচার প্রধানতঃ আত্মনিষ্ঠ হয়ে উঠে এ কথা খুবই সত্য, তবে আত্মনিষ্ঠ সমালোচনা সন্তোষজনক নয় বলে বিচারকে বস্তুনিষ্ঠ করে তোলার ঝোঁকও খুব স্বাভাবিক। আমরা দেখতে পাই, প্রতিভানবাদের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই শিল্পতত্ত্বে অরূপ রূপবাদ বা নির্মিতিবাদ—(কনাফিগারেশান খিওরি) দেখা দিয়েছে। এই মতবাদকে 'অরূপ রূপবাদ' বললাম এই কারণে যে এই মতবাদ শিল্পে নৈর্ব্যক্তিক রূপের (এ্যাবস্ট্রাকট ফর্ম) পক্ষপাতী। বিগত অর্ধশতাব্দীকালে শিল্পকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, শিল্পের স্বাতন্ত্র্য, স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এবং রূপৈকপরতন্ত্রতা প্রতিপাদন করার জন্য এক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্বার আগ্রহ দেখা দিয়েছে। এঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে শিল্প এক মনের অভিজ্ঞতাকে

অন্য মনে সঞ্চারিত করার উপায় নয়, প্রাকৃতিক বস্তুর সদৃশ কোন বস্তু তৈরি করা নয়, শিল্প সম্পূর্ণ এক নতুন উদ্ভাবন যা প্রাকৃতিক বস্তু অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুন্দর—রূপের এক অভিনব জগৎ। এই মতবাদটি শিল্পতত্ত্বে বাস্তববাদ, আবেগবাদ, আনন্দবাদ, প্রকাশবাদ প্রভৃতি প্রচলিত মতবাদ মানে না. মানে না শিল্পের সংগঠনাতিরিক্ত অন্য কোন উদ্দেশ্য। এডওয়ার্ড ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই এঁদের বক্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে, তিনি লিখেছেন—"ছবিকে আজ আমরা প্রকৃতির চিত্তাকর্ষক অংশবিশেষ দেখার গবাক্ষ হিসাবে গণ্য করিনে, ছবি আজ আর শিল্পীর ব্যক্তিগত ভাবাবেগ প্রকাশের উপায় বিশেষও নয়, ছবি আজ শুধু ছবিই—একটি বস্তু, এক নতুন ঐক্য—নতুন সমন্বয় যা আমাদের সৌন্দর্যবোধের পরিধিকে বাড়িয়ে দেয়।" এরিক গ্রিল তাঁর "আর্ট ননসেন্স এ্যাণ্ড আদার এসেস্"-এ (১৯২৯) লিখেছেন—"অনেক লেখক ও সমালোচক মনে করেন—শিল্প হচ্ছে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ এবং শিল্পবিচারের মানদণ্ড হচ্ছে নৈতিক চরিত্র যা শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ এক মহাভুল .....শিল্পকে যা মূল্যবান ক'রে তোলে তা' শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছাপ নয়, বস্তু হিসাবে শিল্পের স্বকীয় উৎকর্ষ .... সৌন্দর্যই শিল্পের একমাত্র মূল্য।" বলা বাহুল্য শিল্প থেকে অন্যান্য পুরুষার্থ সরিয়ে রাখলে শিল্পে একমাত্র রূপই অবশিষ্ট থাকে। এই রূপকেই ইংরেজিতে "ফর্ম" "স্ট্রাক্‌চার", "কনফিগারেশান" প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। রূপ বলতে যথাযথ কি বুঝায় তা' নিয়ে মতভেদ থাকলেও কনফিগারেশানবাদীদের অভিপ্রায় বুঝতে খুব বেগ পেতে হয় না ; কারণ এঁদের ধারণা শুধু তত্ত্বের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয় নাই, চিত্রশিল্পের এবং ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দিয়েছে। আধুনিক রীতির চিত্রকর ও ভাস্করেরা আজ রূপকে বস্তুশূন্য অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক করে তুলতে বদ্ধপরিকর প্রাকৃতিক কোন বস্তুর সঙ্গে শিল্পের যাতে কোন সাদৃশ্য না থাকে সেজন্য তাঁরা অতি সতর্ক। এঁরা আবেগোদ্দীপক কোন মূর্তি আঁকতে চান না, যদিও বা কোন মূর্তির আদল এসে

যায় তা' থেকে ইন্দ্রিয়োদ্দীপক আবেদন—আবেগোদ্দীপক সংকেত বাদ দিয়ে মূর্তিটিকে "স্থির মূর্তিতে (স্টীল-লাইফ) পরিণত করতে চেষ্টা করেন। ইন্দ্রিয়োত্তেজক ব'লে যেটুকু থাকে সে শুধু রঙের বা শ্বেতপাথরের বা ব্রোঞ্জের বর্ণাভা। রঙ, আকৃতি সব কিছু, শিল্পী যে "ফর্মাল প্যাটার্ণ (রূপ পরিকল্পনা) করেন, তারই উপাদানকারণে পর্যবসিত হয়। তিন প্রকারে এঁরা এই কাজটি করেন।

(ক) কখনও কখনও বস্তুর রূপ থেকে ক্রমশঃ অপ্রয়োজনীয়কে বাদ দেওয়া হয় এবং বাদ দিতে দিতে একটি নতুন আকার—নৈর্ব্যক্তিক আকার জন্মলাভ করে। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর—ব্রাঙ্কুশির এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাঁর "উড়ন্ত পাখী" নিয়ে যখন মামলা হয়েছিল তখন আমেরিকার বিচারক মন্তব্য করেছিলেন—"এ পাখীর মাথা নেই, পা নেই, পালকও নেই"। চিত্রের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন—Gauguin, Matisse, কখনও কখনও Andre Derain এবং পূর্ণমাত্রায় পল ক্লি।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি হ'ল—যথেচ্ছভাবে সাজানো কতকগুলি বস্তুর ধাঁচ দেখে নতুনতর একটা আকার বা ধাঁচ সৃষ্টি করা। একত্রে যে-সব বস্তুর সমাবেশ ঘটানো হয় তাদের বস্তু ব'লে চেনা যায়, প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যও বেশীকম থাকে, কিন্তু ঐ সাদৃশ্য ততটুকুই রাখা হয় যতটুকু নতুনতর আকারটির জন্য অপেক্ষিত, সমগ্র রূপের আকর্ষণটি সর্বাতিশায়ী বা সর্বেসর্বা করে রাখার পক্ষে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় না। জর্জ ব্রাক, বুয়ান গ্রিস্, ওজেনফন্ত, পল ন্যাশ এবং আরো অনেকে এই রীতির ভক্ত। (গ) তৃতীয় রীতি হল—জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আকৃতি সদৃশ আকৃতি নির্মাণ করা। এই রীতিতে যাঁরা রূপকল্পনা করেন তাঁরা প্রাকৃতিক বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকে অথবা ঐ বস্তুকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলার চেষ্টা করে—রূপবিকল্পনা করেন না, তাঁরা uninhabited creation-এর—অনধ্যসিত সৃজনের রীতি অবলম্বন করেন, রূপের সঞ্চিত সংস্কারকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন। পিয়েরেই, মনড্রিয়ান, নোম গাবো, অাঁতোয়া পেভসনে, বেন নিকলসন,

বারবারা হেপওয়ার্থ প্রমুখ শিল্পীরা এই তৃতীয় রীতির ভক্ত। এই সম্প্রদায়েরই আধুনিকতররা সংগীতকে "ধ্বনির স্থাপত্য" (আরকিটেকচার অফ সাউণ্ড) ব'লে আখ্যা দিয়েছেন এবং এই কথাই বলেছেন যে সংগীত হ'ল শোনার-জন্য-তৈরি ধ্বনির এক সংগঠন, যা অন্য কোন বিষয়কে উপস্থাপিত করে না, যার সঙ্গে আবেগের এমন কোন অনুষঙ্গ নেই, যা সংগঠনটির উপলব্ধি থেকে, রূপজনিত শৈল্পিক আবেগ থেকে মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে।

অবশ্য শিল্পকে রূপকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে দেখার প্রবণতা একেবারে হাল আমলের ঘটনা নয়। অতি প্রাচীন যুগ থেকেই এই প্রবণতাটি চ'লে আসছে। শিল্প অনুকৃতিকরণই হোক আর যাই হোক, শিল্প যে বাহ্যতঃ একটি সমগ্র ও সমন্বিত সংগঠন একটি 'অর্গানিক হোল'—অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধসম্পন্ন একটি সমগ্র পদার্থ এবং শিল্পের উৎকর্ষ বা সৌন্দর্য যে নির্মাণ-নৈপুণ্যের উপরে—"অর্গানিক ইউনিটির" উপরে—সেন্ট অগাস্টিন ও টমাস একুইনাসের কথা ধার করে বললে—পূর্ণতা সুষমতা ও পরিচ্ছন্নতার মাত্রার উপরে নির্ভর করে, এ ধারণা প্লেটো-এরিস্টটলের আমল থেকেই চলে আসছে। আর ঐ ধারণা খুবই স্বাভাবিক। শিল্পী রূপনির্মাণ করেন একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য—রূপ নির্মাণ ক্ষমতারই পার্থক্য। তাই যিনি রূপকে যত নির্দোষ ক'রে তুলতে পারেন, তিনি তত কুশলী বলে সমাদৃত হন এবং রূপকে নির্দোষ ক'রে তোলা বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, যে-সব উপাদান সংযোগে রূপটি নির্মিত হয় তাদের সুবিন্যস্ত করা, সুগ্রথিত করা ছাড়া আর কিছুই নয় এ ধারণা সব দেশের এবং সব যুগের শিল্প রসিকের মধ্যেই দেখা গিয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের কথাই ধরা থাক। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণের যে ধারাবাহিক ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা হয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে, সেখানে একদল যেমন বিষয়বস্তুর উপরে অন্যদল তেমনি প্রকাশ-রীতির উপরে জোর দিয়েছেন। অলংকারবাদীরা বলেছেন 'কাব্যং গ্রাহ্যমলকারাৎ'—অর্থাৎ অলংকরণের মধ্যেই কাব্যত্ব নিহিত। রীতিবাদীরা বলেছেন —'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'—কাব্যের আত্মা হল রীতি বা পদসংঘটনা কুশলতা।

বক্রোক্তিবাদীদের মত "বক্রোক্তি কাব্যজীবিতম"—বক্রোক্তিই কাব্যের জীবন অর্থাৎ প্রাণ (বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্য ভঙ্গীভাণিতিরুচ্যতে)। শব্দার্থবাদীরা বলেছেন—কাব্য হ'ল অদোষ ও সগুণ এবং কখনও কখনও অনলঙ্কৃত শব্দার্থ (তদদোষী শব্দার্থৌ সগুণাবলংকৃতী পুনঃ কাপি)। উল্লিখিত মতবাদগুলি কাব্যের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ও নৈপুণ্যকেই যে কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণের ভিত্তি করেছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইয়োরোপীয় শিল্পদার্শনিকদের মধ্যেও দেখা যায়—এরিস্টটল "অর্গানিক ইউনিটি"-কেই শিল্পের চরমোৎকর্ষ ব'লে নির্দেশ করেছিলেন। বলাবাহুল্য অর্গানিক ইউনিটির বিচার আসলে রূপেরই বিচার। অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রশিল্পী হোগার্থ, তাঁর "এনালিসিস্ অফ বিউটি" (১৭৫৩) গ্রন্থে খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন—ছবির সমালোচনা বিষয়বস্তু বা অনুকরণ যথাযথ হ'য়েছে কিনা তার বিচার নয়, আসলে "ফর্ম"-এর বিচার, যার উৎকর্ষলক্ষণ হ'ল—সামঞ্জস্য (সিম্‌মেট্রি), বৈচিত্র্য (ভেরাইটি), সমন্বয় বা সমরূপতা (ইউনিফর্মিটি), সরলতা (সিমপ্লিসিটি), জটিলতা (ইন্‌ট্রিকেসি) এবং বহুলতা (কোয়ানটিটি)। এই শতাব্দীরই লোক, মূর্তি শিল্পের ইতিহাস রচয়িতা জোহান জোয়াশিম ভিঙ্কেলম্যান (১৭৬৪) ফর্মকেই শিল্পের কেন্দ্রীয় সমস্যা ব'লে ঘোষণা করেছিলেন বটে কিন্তু ফর্মকে তিনি 'expression of the true character of the soul' বলায় অনেকটা সাপেক্ষবাদী দৃষ্টিতেই ফর্মকে দেখেছিলেন, যদিও সামঞ্জস্য সৌন্দর্যের বিলক্ষণ লক্ষণ এ কথাটি বলতেও তিনি ভুলেন নি। তবে রূপকে স্বতন্ত্র বস্তুর মর্যাদা দিয়ে, নিছক বস্তু হিসাবে বিচার করার প্রথম প্রচেষ্টা দেখা যায় ফ্রেইড্রিস হার্বার্টের মধ্যে (১৭৭৬-১৮৪১)। তাঁর শিষ্য রবার্ট জিমারম্যান (১৮৬৫) "phenomenology of form" চর্চার সূচনা করেছিলেন এবং রবার্ট ভাইশেরের (Vischer) এম্প্যাথি-বাদের বিপরীত দিকে চলতে লাগলেন। ভিলহেল্‌ম বরিঙ্গের এই আলোচনায় অনেকখানি শক্তি যুগিয়েছিলেন এবং হার্বার্টের অন্যতম শিষ্য কোনরাড্ ফিড্‌লের—"pure visibility (বিশুদ্ধ দৃশ্যত্ব) তত্ত্বের অবতারণা করলেন, ইংলণ্ডে রোজার ফ্রাই রূপের উপরে গুরুত্বারোপ করলেন এবং রূপের আবেগ-অনুভূতি-বিষয়নিরপেক্ষ

স্বকীয় মূল্যের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। ১৯১৪ খ্রীঃ ক্লাইব বেল মহাশয়ের মুখেও শোনা যায়—শিল্পতত্ত্বের মূল সমস্যাই হ'ল—"Significant form"। কিন্তু ক্লাইব বেল মহাশয় "সিগনিফিকাণ্ট ফর্ম"-এর লক্ষণ নির্দেশ করতে কৃতকার্য হন নি—অন্যান্যাশ্রয়-দোষ এড়াতে পারেন নি। "সিগনিফিকাণ্ট ফর্ম" হ'ল সেই ফর্ম যা' আমাদের মধ্যে "শৈল্পিক আবেগ" উদ্রিক্ত করে এবং শৈল্পিক আবেগ হ'ল সেই আবেগ যা' 'সিগনিফিকাণ্ট ফর্ম' থেকে জন্মে, এই ধরনের কথা বলা বা 'সিগনিফিকাণ্ট ফর্ম হ'ল শিল্পের সেই গঠনগত উৎকর্ষ যা'কে উপলব্ধি করা যায় কিন্তু ব্যাখ্যা ক'রে বলা যায় না, যা' মনে বিশিষ্ট এক প্রকার কাম্য আবেগ জাগায়, বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যায় শিল্পরূপের উৎকর্ষ বিচারের নির্দিষ্ট মানদণ্ড পাওয়া যায় না।

এখন তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চাই যাঁরা রূপ-বিচারের বাস্তব মানদণ্ড নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এঁদের বক্তব্যের সার কথা এই যে শিল্পরূপের আসল বৈশিষ্ট্য হল—'অর্গানিক ইউনিটি' বাংলায় যাকে আমরা বলতে পারি অঙ্গাঙ্গিযোগ বা সমন্বয়। এই কথাটির প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় এরিষ্টটলের পোয়েটিকস গ্রন্থে। নাটকের বৃত্ত-গঠন আলোচনা প্রসঙ্গে এরিষ্টটল বলেছেন—বৃত্ত হবে একক এবং সমগ্র ঘটনার উপস্থাপনা—তার অংশগুলি একে অন্যের সঙ্গে এবং সকলে অংশীর সঙ্গে এমনভাবে অন্বিত থাকবে যে কোন একটি সরিয়ে বা বাদ দিলে সমগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে বা সমগ্রের রূপ বদলে যাবে। যাকে সরিয়ে নিলে বা রাখলে সমগ্রের বৈশিষ্ট্যে কোন ইতর বিশেষ হয় না তাকে যথার্থ অংশ বলে গণ্য করা যায় না। এরিষ্টটলের এই 'অর্গানিক ইউনিটি'র সূত্রটি শিল্পের রূপ বিচারে বিশিষ্ট মর্যাদা পেয়েছিল এবং রূপ-বিচারের দিগদর্শক হিসাবে কাজ করেছিল। ঐ সূত্রটি আজও রূপবিচারের মূল সূত্র হয়ে আছে—এ কথা বললে কিছুই বাড়িয়ে বলা হয় না। বিংশ শতাব্দীতে 'অর্গানিক ইউনিটি'র স্বরূপ নির্ধারণ করার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা হয়েছে। ম্যাক ট্যাগার্ট (দ্রষ্টব্য নেচার অফ একজিসটেন্স"—অস্তিত্বের প্রকৃতি ১৯২১-২৭) অর্গানিক ইউনিটি'র সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে লিখেছেন—**Any complex whole is manifested in each**

ডঃ ব্রোড ম্যাকট্যাগ্‌গার্টের দর্শন আলোচনা (১৯৩৩) করতে গিয়ে উল্লেখযোগ্য একটি মন্তব্য করেছেন, তিনি বলছেন—ম্যাকট্যাগ্‌গার্ট অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক সম্বন্ধে যা বলেছেন তা' নিশ্চয়ই সত্য তবে সম্পূর্ণ তুচ্ছ কথা। যাঁরা "আঙ্গিক ঐক্য"কে শিল্পের বৈশষিকে লক্ষণ বলে স্বীকার করেছেন তাঁরা এত ব্যাপক অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করেননি। যা' হোক ডঃ ব্রোডের দেওয়া সংজ্ঞাটি অনেকের মনঃপূত হ'য়েছে। এইভাবে তিনি "আঙ্গিক ঐক্য" বুঝাতে চেষ্টা করেছেন—"আমি মনে করি যাঁরা সমগ্রকে "আঙ্গিক ঐক্য" বলে মনে করেন তাঁরা এই কথাই বলতে চান যে সমগ্র হ'ল এমন কিছু যার কোন অংশই অন্যান্য অংশ না থাকলে থাকতে পারে না এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমনটি দেখা যায় তেমনটি ছাড়া অন্যরকম হতে পারে না। (I believe that othor people who have called a whole 'W' an organic unity have meant that 'W' is such that no part of it could have existed unless all other parts had existed and had stood to each other in the relations in which they in fact stand) এ সম্বন্ধে ১৯২৬ খ্রীঃ ডি উইট পার্কার তাঁর 'শিল্প-বিশ্লেষণ' (দি এনালিসিস্ অফ আর্ট) গ্রন্থে লিখেছেন—"এর অর্থ আমি এই বুঝি যে শিল্পের প্রত্যেকটি উপাদান তার মূল্যের জন্য আবশ্যক; শিল্পে এমন কোন উপাদান থাকবে না যা' এইভাবে অপরিহার্য নয় এবং তা'তে যা' যা' আবশ্যক তাদের সব কিছুই রয়েছে। 'মূল্য' শব্দটির জায়গায় 'সৌন্দর্য' শব্দ বসালে এই সিদ্ধান্তেই পৌছানো যাবে—সৌন্দর্য হ'ল—"অর্গানিক ইউনিট" "অঙ্গাঙ্গিক ঐক্য"। পার্কার মহাশয়ের বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে সুসংহত গঠনের মধ্যে এমন একটা গুণ উদ্ভূত হয় যে গুণটি দেখা দিলে সমগ্রের অংশগুলিতে, সমগ্রের বা সংহতির ক্ষতি না ক'রে কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় না।

অতি-আধুনিককালে হ্যারোল্ড্ ওসবোর্ণ মহাশয়, তাঁর বিখ্যাত "এস্থেটিকস এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজিম" গ্রন্থে, অর্গানিক ইউনিটিকে—অঙ্গাঙ্গিক ঐক্যকে—সৌন্দর্যের বৈশেষিক লক্ষণরূপে প্রতিপাদিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত

করা যাক—"the works of art an essentially organized constructs of perceptaul impressions and they are organized at different degrees of compactness" অর্থাৎ আমরা যাকে শিল্প বলি সেগুলি আসলে ইন্দ্রিয়লভ্য প্রতীতির সংগঠিত নির্মিতি এবং ঐ প্রতীতিগুলি সংগঠিত হয় সংহতির বিভিন্ন মাত্রানুসারে। তিনি বলতে চেয়েছেন—অনেকে শিল্পকে বস্তু-হিসাবে গণ্য করতে অভ্যস্ত, কারণ তাঁরা দেখেন যে স্থাপত্য-শিল্প বলতে বুঝায় প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি; ভাস্কর্য বলতে বুঝায়—পাথরের বা ব্রোঞ্জের বা অন্য কোন ধাতু দিয়ে গড়া অন্য কোন উপাদানে তৈরি মূর্তি; চিত্রকলা বলতে বুঝায় পটের-উপরে-আঁকা কোন-কিছুর প্রতিরূপ; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যে সংগীত আসলে "a set of musical sounds" কতকগুলি সুরেলা ধ্বনির সমাবেশ। কাব্য হচ্ছে, কতকগুলি শব্দের পরম্পরা (a set of words)। মোটকথা এই যে শিল্প আসলে বিশিষ্ট-আকারে-সংগঠিত ইন্দ্রিয় প্রতীতির সমষ্টি (characteristic set of sense perceptions)। এই সব সংগঠনের মধ্যে সংহতির মাত্রা সবক্ষেত্রে সমান থাকে না, কোথাও বেশী কোথাও কম। যে ক্ষেত্রে সংহতির মাত্রা অধিক সেখানেই সংগঠনটি সুন্দর, যেখানে মাত্রা কম সেখানে শিল্পটি অসুন্দর। এখানেই আর একটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। "'শিল্প আসলে 'বিশিষ্ট আকারে সংগঠিত ইন্দ্রিয় প্রতীতি" এই কথাটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। এবং তা' এই যে আমরা সাধারণ আলাপ আলোচনায় যাকে শিল্প ব'লে থাকি, আসলে তা' শিল্পের সম্ভাবনামাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত না তা' কোন উপযুক্ত ব্যক্তির গোচরীভূত হয় ততক্ষণ তা' "actualized"—হয় না স্বরূপতঃ ব্যক্ত হয় না—অর্থক্রিয়াকারী হয় না। এই কথা মনে রেখেই ওস্‌বোর্ণ লিখেছেন—A work of art is a perduring potentiality for actualization of a specific set of perceptions"—শিল্প সুনির্দিষ্ট প্রতীতি-পরম্পরা জন্মানোর স্থায়ী সম্ভাবনা বিশেষ। ওসবোর্ণের অনেক আগে এই একই কথা বলেছিলেন বেনিডেট্টো ক্রোচে; শিল্পকে তিনি—physical '

stimulants of reproduction”—প্রতিভান পুনরুদবোধনের বাস্তব উদ্দীপক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে সুন্দর বস্তু হচ্ছে—physical stimulants of aesthetic reprodnction”। সুন্দর কোন বস্তুতে নিহিত থাকে না, সুন্দর থাকে আত্মিক ক্রিয়ায়, বস্তু ঐ ক্রিয়ার নিমিত্ত মাত্র। ক্রোচের এবং ওসবোর্ণের এই সিদ্ধান্তের অনুসিদ্ধান্ত এই যে শিল্পিকৃত প্রতীতি-সমাবেশকে যত সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে, তত শিল্পের স্বরূপ ব্যক্ত হবে, শিল্প বাস্তবত্ব লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ শিল্প যেহেতু সুসংহতভাবে সংগঠিত প্রতীতিসমুদয়, শিল্পোপলব্ধিতে যে প্রতীতি-সমাবেশটি ফুটে উঠে তাতে একটিমাত্র সংগঠনই সম্ভব, তার মধ্যে কোনরকম পরিবর্তন ঘটালে সংগঠনের সমগ্রতার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। সাধারণ প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি থেকে শৈল্পিক উপলব্ধির পার্থক্য এখানেই, সাধারণ প্রতীতিতে তেমন কোন গঠনগত সংহতি থাকে না, শৈল্পিক প্রতীতিতে সংহতিই বড় এবং একমাত্র কথা। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক জন ডিউই মহাশয়কৃত শিল্পের সংজ্ঞা মনে আসতে পারে। তাঁর মতে শিল্প হ'ল সুসংগঠিত বা পরিবর্ধিত প্রতীতি—“heightened experience” সাধারণ উপলব্ধি (experience) এবং শিল্পের মধ্যে পার্থক্য এই যে শিল্পে যে প্রতীতি-প্রকাশিত হয় তা' ‘heightened’। উদ্দীপক প্রতীতি (হাইটেনড এক্সপিরিয়েন্স) লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—সুসমন্বয় এবং সুসংহততা এই দু'টি বৈশিষ্ট্যই বা গুণই হচ্ছে “হাইটেনড্ এক্সপিরিয়েন্স”-এর ধর্ম। অবান্তরকে বর্জন এবং আবশ্যককে গ্রহণ তথা একক এবং সমগ্র না করলে প্রতীতিকে উদ্দীপক করা যায় না। মোটকথা প্রতীতিকে উদ্দীপক করতে হ'লে প্রতীতিকে সুসমন্বিত, সুসংহত, এবং একক তথা সমগ্র করতে হবে এবং এমনভাবে করতে হবে যাতে সমগ্রই প্রথমে এবং প্রধানভাবে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। জন ডিউইকৃত ব্যাখ্যাই হ্যারোল্ড ওসবোর্ণের ভাষায় “definiteness or compactness of organ'zation”—অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট বিশিষ্ট সুসংহত প্রতীতি-সংস্থানকেই ওসবোর্ণ “অর্গানিক ফর্ম”—“অজাদিক রূপ” বা

'কনফিগারেশান' নাম দিয়েছেন। এই "কনফিগারেশান"-এর অঙ্গাঙ্গিযোগযুক্ত রূপের উপলব্ধি সম্ভব হয় শৈল্পিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ নির্বিকল্পক জ্ঞানে। প্রাচীন মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রে যে শাস্ত্র "ফ্যাকাল্‌টেটিভ সাইকোলজি" নামে পরিচিত প্রত্যেক প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে খণ্ড থেকে অখণ্ডের উপলব্ধিতে পৌছানোর ব্যাপার বলে মনে করা হ'য়েছে—সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র রসের আস্বাদন প্রক্রিয়া বুঝাতে যে ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করে বলেছে—"খণ্ডপো যাতি অখণ্ডতাম"। কিন্তু অতি-আধুনিক "কনফিগারেশান সাইকোলজি" এই কথাই প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করেছে যে—"**in all awareness certain patterns or configurations immediately and directly leap to awareness without this summative process**"—অর্থাৎ প্রত্যক্ষকালে আমরা খণ্ডের জ্ঞানের ভিতর দিয়ে অখণ্ড উপলব্ধিতে পৌছাইনে। বরং এর বিপরীত ঘটনাই ঘটে। প্রত্যক্ষকালে সমগ্রের রূপটি মনে তৎক্ষণাৎ ও অখণ্ডরূপে উদ্ভাসিত হয় এবং তা খণ্ড খণ্ড উপলব্ধির যোগফল নয়। একটি সমগ্র রূপকে এইভাবে নির্বিকল্পক উপলব্ধিতে পাওয়া দৃষ্টির এক গ্রাসে গ্রহণ করা, একেই বলা হয়েছে—"সাইনোপটিক ভিশান" (**synoptic vision**) অথবা শৈল্পিক চেতনা (**aesthetic awareness**), এই দৃষ্টির বিষয়ীভূত হ'তে পারে শুধু সেই প্রতীতি-ক্ষেত্রটিই যাতে "অর্গানিক ইউনিটি" বর্তমান। 'সাইনোপটিক ভিশ'ন' ছাড়া যেমন সমগ্রকে একসঙ্গে সাক্ষাৎকার করা যায় না, তেমনি সমগ্র অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিযোগযুক্ত রূপ না হলে এই দৃষ্টি কার্যকরী হতে পারে না। শৈল্পিক সমগ্রের এবং দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হল তা' বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং স্মরণীয় এই কারণেই যে কনফিগারেশানবাদী সমালোচনার প্রকৃতি বুঝতে—"সাইনোপটিক ভিশান"-এর পরিচ্ছন্ন ধারণা অপরিহার্য। 'কনফিগারেশানাল সাইকোলজি?'—সিদ্ধান্ত আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আর একবার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রত্যক্ষকালে অংশের বা খণ্ডের উপলব্ধি আগে অথবা অংশীর জ্ঞান আগে হয় এ বিষয়ে কনফিগারেশনবাদীরা বলেন—আগে হয় অংশীর বা সমগ্রের জ্ঞান,

পরে হয় অংশের জ্ঞান। এ বিষয়ে আলোচনা করার—প্রতিবাদ বা সমর্থন করার ইচ্ছা এবং অবকাশ এখানে নেই এখানে শুধু এইটুকুই দেখাতে চাই—ফ্যাকালটেটিফ এবং কনফিগারেশানাল সাইকোলজির দৃষ্টিতে পার্থক্য আছে এমনি একটি সংবাদের ঘটনা আমাদের দেশেও ঘটেছিল 'অর্থবোধ' বিষয়কে কেন্দ্র করে। অর্থবোধে পদের অর্থটি আগে মনে আসে অথবা বাক্যের অর্থবোধের পরে পদের অর্থ জানা যায় এ নিয়ে দুটি দল গড়ে উঠেছিল। যাঁরা মনে করেন—প্রত্যেকটি পদের অর্থবোধ হওয়ার পরে সমগ্র বাক্যের অর্থবোধ হয়, তাঁরা অভিহিতান্বয়বাদী নামে পরিচিত, আর যাঁরা মনে করেন—আগে বাক্যের বা সমগ্রের অর্থবোধ হয়, পরে অংশের বা পদের অর্থবোধ হয়, তাঁরা অন্বিতাভিধানবাদী নামে পরিচিত।

মোট কথা—অঙ্গ-অঙ্গীর জ্ঞানে অঙ্গজ্ঞান আগে অথবা অঙ্গীর জ্ঞান আগে হয় এ নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মতভেদ সে যাই থাক, আমাদের মনে রাখতে হবে—'সাইনোপটিক ভিশান' অর্থাৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের সম্ভাবনার কথা। এই ধরনের দৃষ্টির স্বীকৃতি আমরা ক্রোচের প্রতিভানবাদেও লক্ষ্য করেছি। ক্রোচের কাছে 'ইউরেকা!' শব্দটি যেমন একক একটি প্রতিভান তেমনি পঞ্চাঙ্ক একখানি ট্রাজেডিও একক প্রতিভান। এই দুইটি প্রতিভানের মধ্যে পার্থক্য এই—He who conceives a tragedy puts into a crucible a great quantity so to say, of impressions" যিনি একখানি ট্রাজেডির ধারণা করেন তিনি এক কেন্দ্রে অনেক পরিমাণ প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট করে থাকেন।

এবার কনফিগারেশানবাদী শিল্প-সমালোচনার রীতি ও সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার তৃতীয় বক্তৃতা শেষ করছি। যেমন প্রতিভানবাদী শিল্প-সমালোচনায় শিল্পিকৃত প্রতিভানকে মনের মধ্যে যথাযথ ভাবে পুনরুদবোধিত করার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিভানের মূল্যকে কল্পনায় পরামর্শ দিয়ে বিচার করতে বলা হ'য়েছে তেমনি কনফিগারেশানবাদী সমালোচনাতেও শিল্পরূপটিতে যে প্রতীতিসমাবেশ রয়েছে, তাকে সমালোচকের চেতনায় যথাযথ

ভাবে 'actualized' করার উপরে জোর দেওয়া হ'য়েছে। যেমন প্রতিভান-বাদে সৃজনী বৃত্তি "প্রতিভা" এবং মূল্যবিচারবৃত্তি—"রুচি" মূলতঃ একই অর্থাৎ প্রাতিভানিক ব্যাপার, তেমনি অপূর্বরূপ-নির্মিতিবাদেও স্রষ্টার ও সমালোচকের বড় বৈশিষ্ট্য—সমগ্রসাক্ষাৎকারী দৃষ্টি—সাইনোপটিক ভিশান। এঁরা মনে করেন—সহজাত শক্তি, একাগ্র মনোযোগ এবং বহুকালব্যাপী অনুশীলন এক হ'লে তবেই এই দৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করে এবং যথার্থ সমালোচক এক দৃষ্টি-গ্রাসে সমগ্র সৃষ্টিকে "as a unity and a whole"-রূপে গ্রহণ করতে পারেন। এই দৃষ্টির পূর্ণতা দু'একজন ভাগ্যবানের ভাগ্যেই ঘটে। পূর্ণতা আসুক বা না-আসুক মনে রাখতে হবে, আদর্শ সমালোচকের একমাত্র গুণ এই সাইনোপটিক ভিশান—শিল্পকর্মের বৈচিত্র্যকে ও ঐক্যকে যুগপৎ গ্রহণ করার এবং মনের মধ্যে উদভাসিত করে রাখার ক্ষমতা। সমালোচক যখন কোন সৃষ্টিকে সমালোচনা করতে অগ্রসর হন, তখন তো শুধু সেই শিল্প কর্মেরই রূপটিকে মনের সামনে ধরে রাখেন না, ঐ জাতীয় আরো অনেক শিল্পকর্মের রূপ মনের মধ্যে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখেন। এতগুলি সমগ্ররূপকে মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা, ফুটিয়ে তোলা রূপগুলিকে যথাযথভাবে ধরে রাখা—এর চেয়ে দুঃসাধ্যতম মানসিক ব্যাপার আর কি হ'তে পারে? এই দিক থেকে দেখলে আদর্শ সমালোচক 'কোটিকে গোটিক মেলে'। অধ্যাপক স্যাণ্টাষানা সংগীত সমালোচনা প্রসঙ্গে যা' বলেছেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর "রিজিন ইন আর্ট" (১৯০৫)—গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—[Both in scope and in articulation musical faculty varies prodigiously. There is no fixed limit to the power of sustaining a given conscious process while new features appear in the s*o*me field; nor is there any fixed limit to the power of recovering. under changed circumstances, a process that was formerly suspended.• A whole symphony may be felt at once if the musicion's power of sustained or cumulative

hearing could stretch so far. As we survey two notes and their interval in one sensation...so a trained mind might survey a whole composition. This is not to say that time would be transcended in such an experience, the appreciation would still have duration and the object would still have successive features for evidently music not arranged in time would not be music, while all sensations with a recognizable character occupy more than an instant in passing. But the passing sensation throughout its lapse, presents some experience and this expoirence taken at any point, may present a temporal sequence with any number members according to the synthetic and analytic power exercised by the given mind. What is tedious and formless to the inattentive, may seem a perfect whole to one who, as they say, take it all in .. .. A musical education is necessery for musical judgment. What most people relish is hardly music, it is rather a drowsy revery relieved by nervous thrills (পৃষ্ঠা. ৫০—৫১)].

"সাংগীতিক বৃত্তির শক্তি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন কোন একটি নির্দিষ্ট মানসিক-ক্রিয়া প্রবাহকে বিশেষতঃ ঐ ক্রিয়াপ্রবাহের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ের উপস্থিতিকে ধারণ করে রাখার শক্তির কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। তেমনি কোন সীমা নেই, কোন কারণে যে ক্রিয়া-পরম্পরা আগে স্থগিত হ'য়ে রয়েছে, পরিবর্তিত অবস্থায় সেই ক্রিয়া-পরম্পরাকে উদ্ধার করার শক্তির। একটি সমগ্র রাগকে এক নিমিষে উপলব্ধি করা যেতে পারে এবং পারে তখনই যখন সংগীতরসিকের আনুপূর্বিক এবং সর্বগ্রাহী শ্রবণক্ষমতা ততদূর সম্প্রসারিত হয়। আমরা সাধারণ লোক, আমরা ছ'টো স্বর এবং দুয়ের মধ্যবর্তী কালব্যবধানকে একই সংবেদনে গ্রহণ করতে পারি ; তেমনি যাঁদের মন পরিশীলিত তাঁরা সমগ্র একটি রচনাকে

যুগপৎ প্রত্যক্ষ করতে পারে। অবশ্য এ কথা বলার অর্থ এ নয় যে, ঐ প্রত্যক্ষ কালকে অতিক্রম ক'রে যায় প্রত্যেক উপলব্ধিতে পারম্পর্য এবং বস্তুটিতে পৌর্বা-পর্য থাকেই, কারণ যে সংগীত লয়-বিভক্ত নয় তা সংগীতই নয় এবং যে সব সংবেদনের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে, তার গতি একাধিক মুহূর্ত অধিকার না করে সম্ভবই হবে না। কিন্তু ঐ গতিশীল সংবেদন চলার ভিতর দিয়ে বিশেষ উপলব্ধির সৃষ্টি করে।

ঐ উপলব্ধি—যে কোন মুহূর্তেই তাকে ধরা হোক না কেন—একটি কাল-পরম্পরা উপস্থাপিত করে—এবং করে বিশেষ মনের সংশ্লেষণী-বিশ্লেষণী শক্তি-অনুসারেই। অমনোযোগীব কাছে যেটি ক্লান্তিকর ও রূপহীন, যিনি সমগ্রকে এক দৃষ্টি বা শ্রুতি পবিধির মধ্যে ধারণ করতে সমর্থ তাঁর কাছে সেটি একটি সম্পূর্ণ সমগ্র। সংগীত বিচারের জন্য সাংগীতিক শিক্ষাভ্যাস আবশ্যক। সংগীত শুনতে গিয়ে অধিকাংশ লোক যা' আস্বাদন করে তা' আসলে তন্দ্রাচ্ছন্ন তেমন একটি আবিষ্ট অবস্থা যা' মাঝে মাঝে স্নায়বিক শিহরন দ্বারা উপশমিত হয়।"

অধ্যাপক স্ট্যাণ্টায়ন সংগীতের ক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টির প্রয়োগ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা'কে কনফিগারেশান-বাদী সমালোচনার সমর্থক বলে মনে করা যেতে পারে। মন্তব্যটি এই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে—যে মন খণ্ড উপলব্ধির সবকিছু স্মরণে রেখে অখণ্ড সমগ্রকে দেখতে পারে, সেই পরিশীলিত মনের দ্বারাই সমালোচনা সম্ভব। তবে "সাইনোপটিক ভিশান" বলতে যে ধরনের এককোটিক একটি সমগ্রগ্রাহী দৃষ্টিকে ধরা হয়েছে, তা' সব ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বহুবিস্তৃত রচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না এ বিষয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে এবং জেগেছেও।

অধ্যাপক টিল্লোটসন তাঁর সমালোচনা ও উনবিংশশতাব্দী (১৯৫১) গ্রন্থে সাহিত্যকে সাইনোপটিক ভিশান দিয়ে গ্রহণ করার অসুবিধার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তিনি লিখেছেন—'আমার পড়া বইয়ের কথা যখন আমি

মনে করি, আমার স্মৃতিতে যা' এসে দাঁড়ায় তাকে আমি মেঘ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারিনে এবং সেই মেঘ খুব আলোকোজ্জ্বল নয়, মাঝে মাঝে দেখি অন্ধকার যা' বেশী-কম চোখে এসে ঠেকে। ধরা যাক হ্যামলেট মনে পড়ল—যে হ্যামলেট প্রায় প্রত্যেক ইংরেজীর ছাত্রের মতো আমারও মুখস্থ, একটি বিশেষ মুহূর্তে সমগ্র হ্যামলেটকে দেখতে গিয়ে আমি দেখি অস্পষ্ট এবং অগ্রাহ্য একখানি মেঘ" (২৫ পৃষ্ঠা)।

[When I think of this read book or that my memory throws up what I can only call a cloud, a cloud not very luminous, sometimes a darkness more or less 'visible'. If I think, say of Hambet, which like most students of English literature I know almost by heart, the nearest I can come at any one moment to seeing it as a whole is to see a cloud ....vague and ungraspable] 'মোট কথা অধ্যাপক টিল্‌লোটসন এক নজরে সমগ্রকে দেখার সম্ভাবনাকে আমল দেননি এবং এই কথাই বলতে চেয়েছেন—খণ্ডের বা অংশের কথা স্মরণ ক'রে ক'রেই সমগ্রের ধারণা গড়ে উঠে এবং স্পষ্ট হয়। হ্যারোলড ওসবোর্ণ টিল্‌লোটসনকে কটাক্ষ ক'রে বলেছেন—একটা গোটা বই মুখস্থ থাকলেই 'সাইনোপটিক ভিশান'-এর অধিকার জন্মায় না। তারপর বহু মুহূর্তব্যাপী উপলব্ধি হ'লেই যে তাকে নির্বিকল্পক জ্ঞানে পাওয়া সম্ভব নয় আর অল্পক্ষণব্যাপী হ'লেই সহজে সামগ্রিক প্রত্যক্ষ সম্ভব এ কথাও ঠিক নয়। একটা ছোট শিল্পবস্তুর মধ্যেও অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান থাকতে পারে এবং বৃহৎ শিল্পবস্তুকে গ্রহণ করার চেয়ে আরো দুর্গ্রাহ্য হ'তে পারে। দুই অধ্যাপকের মতভেদের ভিতর দিয়ে এই সত্যটুকুই আমরা পাচ্ছি যে সমগ্রের জ্ঞান যত পরিচ্ছন্ন হবে, অংশের তাৎপর্য তত সহজে বুঝা যাবে, কারণ অংশীর বা সমগ্র রূপের অঙ্গ হিসাবেই অংশের মূল্য, অংশের পৃথক কোন মূল্য নেই।

এই সমস্যার সমাধানকল্পে ওসবোর্ণ যা' বলেছেন তা' উদ্ধৃত করা যেতে পারে—তিনি ব'লতে চান—এই বিরোধের অবসান ঘটানো যাবে এই যুক্তিতে যে যে গুণ বা ধর্ম সমগ্রতে পরিব্যাপ্ত তা' অনেকাংশে অংশতেও বর্তমান থাকে এবং তা' থ'কে বলেই—মনকে একমহূর্তে সমগ্রের ধারণায় অন্য মুহূর্তে সমগ্রের অংশীদার অংশগুলির ধারণাব নিযুক্ত করা যেতে পাবে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই শিল্পবস্তুর বিচার কর হয় এবং সমালোচন শক্তি পরিপকতা লাভ করে।

[It is owing to this universal pervasiveness of structure that attention can be allowed to oscillate between the whole as a whole and the various contained parts which compose the whole And it is by this process of oscillation that aesthetic objects are studied and appreciation matures .....]

আশা কবি এতক্ষণে সাধারণ কল্পনাবাদ সৃজনশীল কল্পনাবাদ বা প্রতিভানবাদ এবং নৈর্ব্যক্তিক রূপকল্পনাবাদ বা নির্মিতিবাদ (কনফিগারেশান) সম্বন্ধে এবং ঐ মতবাদ শিল্পসমালোচনায় যে যে সমস্যার সৃষ্টি কবেছে তার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মেছে এবং এ কথা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি যে শিল্প-সমালোচনায় সাপেক্ষবাদের এবং নিরপেক্ষবাদের দ্বন্দ্বই মৌলিক সমস্যা।

সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনা

আগের তিনটি বক্তৃতায়, আমি শিল্পতত্ত্ব সমীক্ষায় যে ক'টি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী বা মতবাদ দেখা দিয়েছে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং প্রত্যেক মতবাদের আলোচনায় শেষে বিশেষ মতবাদটি সত্য বলে স্বীকার করলে শিল্প-সমালোচনায় কোন মানদণ্ড গ্রহণ করতে হবে, কোন্ মূল্যকে প্রাধান্য দিতে হবে সে দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। প্রথম বক্তৃতায় আমি বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণ করা হ'য়েছে তার আলোচনা প্রসঙ্গে অনুকরণবাদ, সংকেতবাদ, প্রকাশবাদ, সত্যবিষয়বস্তুবাদ প্রভৃতি মতবাদের বিস্তারিত আলোচনা করেছি; দ্বিতীয় বক্তৃতাতে, শিল্পতত্ত্বে আবেগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বলতে যথার্থতঃ কি বুঝায়, শিল্প অনুভববৃত্তিমূলক সৃষ্টি এবং শিল্প ভাবাবেগের প্রকাশ এই দুই ধারণার পার্থক্য কি এবং আবেগবাদী দৃষ্টি বলতে এই দুই ধারণার কোনটিকে আমরা গ্রহণ করব, আবেগবাদেরই রকমফের আনন্দবাদের বক্তব্য কি, ব্যক্তিগত বাসনা-কামনার পরিপূর্তিজনিত আনন্দ দেওয়া শিল্পের উদ্দেশ্য কি না অথবা শৈল্পিক আনন্দ স্বতন্ত্র এক আনন্দ কি না এই সব প্রশ্নের আলোচনা করেছি। তৃতীয় বক্তৃতায় আমি কল্পনাবাদ, বিশেষতঃ সৃজনশীল কল্পনা-বাদ বা ক্রোচের প্রতিভানবাদের বৈশিষ্ট্য, প্রাক্-ক্রোচে কল্পনাবাদের সঙ্গে ক্রোচের কল্পনাবাদের বা প্রতিভানবাদের পার্থক্য, কল্পনাবাদের মধ্যে বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ রূপ সৃষ্টির প্রবণতা, সেই প্রবণতা কি করে অপূর্ববস্তুনির্মাণবাদে—কনফিগারেশানবাদে পরিণত হ'য়ে নির্বিশয় শিল্পসৃষ্টির আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে, প্রতীভানবাদী শিল্পসমালোচনা রেফারেনশিয়ালিষ্ট অথবা এ্যাবসোলিউটিষ্ট এই প্রশ্নের আলোচনা। রূপের আদর্শে রূপকর্মের বিচার আসলে কিসের বিচার—'অর্গানিক ইউনিটি'র সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণ কিভাবে করা হ'য়েছে, অর্গানিক ইউনিটির উপলব্ধির জন্য যে বিশেষ দৃষ্টি—'সাইনোপটিক ভিশান' সমগ্রগ্রাহী

দৃষ্টি আবশ্যক তার প্রকৃতি কি এবং তার অস্তিত্ব স্বীকার্য কি না, সাহিত্যশিল্পের মতো বহু-দেশকালপাত্রব্যাপী ঘটনার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টি প্রযোজ্য হ'তে পারে কি না, কনফিগারেশানবাদী সমালোচনার সমস্যা 'কে এবং কনফিগারেশানবাদী সমালোচকের কাজ কি এই সব সমস্যা নিয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করেছি। এই সব আলোচনার ফল কি হয়েছে তা' আপনারাই ভাল বুঝতে পারছেন, আমি শুধু এইটুকুই বুঝছি যে সমস্যার মীমাংসা করতে পেরেছি কি পারি নি তার চেয়েও বড় কথা সমস্যা যে আছে, এবং খুবই জটিল এ বিষয়ে আপনাদের সচেতন করতে পেরেছি।

আজকার বক্তৃতার বিষয়—সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা।

এই বক্তৃতায় আমি, সাহিত্য শিল্পের মাধ্যমের বা উপাদানের বিশিষ্টতা, এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সাহিত্য শিল্পের পক্ষে বিমূর্ত বা নিরর্থক উপাদান বিন্যাস কৌশলে পরিণত হওয়া কেন সম্ভব নয়, বিভিন্ন মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গেলে কি কি বাধার সম্মুখীন হ'তে হবে, বিশেষতঃ সাহিত্যশিল্পে কনফিগারেশানবাদ প্রয়োগ করলে অবস্থা কি দাঁড়াবে, সাহিত্য-সমালোচনার প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে নিরপেক্ষরূপবাদী সমালোচনার পার্থক্য কি হবে এই রকম নানা প্রশ্নের আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

প্রথমেই আমি **সাহিত্যশিল্পের বিশেষত্বের** দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনারা জানেন প্রচলিত চারুকলাগুলির মধ্যে উপাদানগত পার্থক্য উপাদান-পার্থক্যের অনিবার্য পরিণাম স্বরূপে বিষয়গত পার্থক্য রয়েছে। অবশ্য দেখতে পাওয়া যায় বিষয়বস্তুর প্রকৃতি উপাদানে এবং উপাদনের শক্তি-সামর্থ্য বিষয়বস্তুতে পার্থক্য নিয়ে এসেছে। আমরা দেখি—স্থাপত্যের বিষয় স্থাপত্যের উপাদানে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে, পাথর দিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করতে হ'লে পাথরকে যে ভাবে ব্যবহার করতে হয়, পাথর দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করতে হ'লে সে ভাবে ব্যবহার করা চলে না। পাথরের পর পাথর সাজিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করতে পাথরকে যে আকারে কেটে নিতে হয়, পাথর থেকে মূর্তি কুঁদে বের করতে পাথরকে

ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ উপাদান বস্তুতঃ এক হওয়া সত্ত্বেও, বিষয়ের পার্থক্যে উপাদানের ব্যবহার ভিন্ন হয়ে যায়।

তারপর কোন উপাদানেরই শক্তি অসীম নয়, প্রত্যেকেই সীমাবদ্ধ। ধরা যাক চিত্রের কথা। রঙ ও রেখার শক্তি ভাস্কর্যের উপাদানের চেয়ে বেশী বটে, সে স্থিতিশীল বস্তুকে বা ব্যক্তিকে অনেকখানি পরিপ্রেক্ষিতসহ উপস্থাপিত করতে পারে বটে কিন্তু স্থান-কালের নির্দিষ্ট বিন্দু বা মাত্রাকে অতিক্রম করতে পারে না। এক কথায় চিত্রকলা স্থিতিধর্মী (static)। আরো একটি কথা। রঙ-রেখা বা সংগীতের সুরেলা স্বর উপাদান হিসাবে একক অর্থাৎ রঙের বাইরে রঙের কোন অর্থ নেই, স্বরের বাইরে স্বরের কোন অর্থ নেই। কিন্তু সাহিত্যের যে উপাদান অর্থাৎ সার্থক শব্দ, তা' একক নয়, তাই স্বভাবে দ্বৈত। একদিকে তা' শব্দ, অন্যদিকে তা' অর্থ। অর্থাৎ যে উপাদান দিয়ে সাহিত্য রচিত হয়, রঙ, আকৃতি, ধ্বনির মতো নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নয়, একাধারে তা' শব্দ ও অর্থ—শব্দরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অর্থরূপে মনোগ্রাহ্য। ভাষা একাধারে সংকেত ও সংকেতিত, এক কথায় দ্বৈত-প্রকৃতিক। সাহিত্যের উপাদানের এই দ্বৈতপ্রকৃতিকতা সাহিত্যের আবেদনে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যের সৌন্দর্যকে একক শব্দগত সৌন্দর্য অথবা একক অর্থগত সৌন্দর্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। এই দ্বৈতপ্রকৃতিকতার জন্যই, সাহিত্যশিল্পের প্রকৃতি অন্যান্য শিল্পের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন হয়েছে, অন্যশিল্পে যে ধর্ম নেই, সাহিত্যশিল্পে সেই ধর্ম দেখা দিয়েছে, অন্য শিল্পের পক্ষে যতখানি বিষয়নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয়েছে, সাহিত্যের পক্ষে ততখানি বিষয়নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয়নি। জাঁ পল সার্ত তাঁর "সাহিত্য কি?" নামক গ্রন্থে (১৯৪৮) এই সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লিখেছেন "আমরা চিত্রকলা ভাস্কর্য এবং সংগীতের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চাইনে একথা ঠিক; কেনই বা চাইবো? বিগত শতাব্দীর কোন লেখক যখন তাঁর নিজের কলা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য বা সূত্র করতেন তখন কি তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কলার ক্ষেত্রেও তাঁর মন্তব্যকে বা সূত্রকে প্রয়োগ করতে বলা হ'ত? কিন্তু আজ এই রীতি

দেখা দিয়েছে আজ সংগীতকারের বা সাহিত্যিকের পরিভাষায় চিত্র সম্বন্ধে কথা বলা হয়, অথবা 'চত্রকরের পরিভাষায় সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলা হয়।.........এ বিষয়ে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যে, বিশেষ যুগের শিল্পসমূহ একে অন্যকে প্রভাবিত ক'রে থাকে, কিন্তু যিনি সাহিত্যশিল্পের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যকে, সংগীতের ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতি দেখিয়ে, মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন তাঁকে প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে শিল্পগুলি সর্বোতোভাবে এক, একের যা' লক্ষণ সকলেরই সেই একই লক্ষণ—শিল্পগুলি সমান্তরাল (parallel)। এ বিষয়ে সার্ত্রের মত খুবই স্পষ্ট—"there is no such parallelism. Here as everywhere, it is not only the form which differentiates, but the matter as well. And it is one thing to work with colour and sound and another to express one self by means of words. Notes, Colours and forms are not signs. They refer to nothing exterior to themselves." অর্থাৎ শিল্পে সমান্তরালতা ব'লে কোন কিছু নেই। যেমন সর্বত্র, তেমনি এখানেও শুধু রূপই যে পৃথক তাই নয়, রূপের সঙ্গে বিষয়বস্তুও পৃথক হ'য়ে যায়। রং এবং সুরেলা ধ্বনি নিয়ে কাজ করা এক কথা, ভাষা দিয়ে কোন কিছু প্রকাশ করা ভিন্ন কথা। সুর, রং, আকার কোন কিছুর সংকেত নয়, অতিরিক্ত কোন-কিছুকে তারা বুঝায় না। অবশ্য কোন সংবেদনই এত নিছক সংবেদন হ'তে পারে না, যার সঙ্গে কোন-না-কোন ভাবের সম্পর্ক বা অনুষঙ্গ একেবারেই থাকে না। Merlean Ponty "The phenomenology of perception"-গ্রন্থে এই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং দেখিয়েছেন প্রত্যেক ঐন্দ্রিয় উপলব্ধিরই সঙ্গে ভাবের ব্যঞ্জনা, উত্তেজনা মিলে থাকে। এ কথা স্বীকার ক'রে নিয়েও, সার্ত্র বলতে চেয়েছেন—রঙের বা শব্দের সংবেদনের ভাব-ব্যঞ্জনা খুবই সামান্য, এবং অতি স্তিমিত, যার ফলে ঐগুলি আমাদের কাছে রঙ এবং শব্দ ছাড়া আর কোন কিছু নয়, আর কোন অর্থই বহন ক'রে আনে না। তাই শিল্পীর কাছে রঙ ও শব্দ বস্তুবিশেষ। তিনি রঙের শোভায়, শব্দের

ধ্বনিমাধুর্যেই মুগ্ধ। শিল্পী—"stops at the quality of the sound or the form. He returns to it constantly and is enchanted with it."

চিত্রশিল্পী যেমন পটের উপরে রঙ বস্তুটির বিন্যাস দেখাতে চান, সুরকারও তেমনি সুরেলা ধ্বনির সমাবেশ ঘটিয়ে রাগ সৃষ্টি করেন। চিত্রের অর্থ যেমন রঙ বিন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, রাগের অর্থও তেমনি রাগের মধ্যেই নিহিত। অন্যপক্ষে লেখক বা সাহিত্যিক তো রঙ বা ধ্বনির মতো এক প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে কারবার করেন না তাঁরা কারবার করেন শব্দার্থ নিয়ে, এক কথায় অর্থ নিয়ে। অবশ্য একথা সব সময়েই স্বীকার করতে হবে যে, প্রবন্ধকার গদ্যের জগতে যেভাবে শব্দকে ব্যবহার করেন কাব্যের জগতে সাহিত্যিক সে ভাবে শব্দকে ব্যবহার করেন না। এবং এই কথা বলাই ঠিক—সার্ত্র বলছেন—কবিরা শব্দকে ব্যবহার করেন না, শব্দের প্রভুত্ব মেনে চলেন—"poets are men who refuse to utilize language"। এই উক্তির তাৎপর্য এই যে কবিরা শব্দার্থের সাহিত্য সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে শব্দকে ব্যবহার করেন না। "সেমাণ্টিকসে"র পরিভাষায় বললে বলতে হবে—কবিরা শব্দকে 'সাইন' হিসাবে ব্যবহার করেন না, 'বস্তুর সংকেত হিসাবে ব্যবহার করেন। সার্ত্র অবশ্য অন্য অর্থে সংকেত কথাটি ব্যবহার করে লিখেছেন—কবির মনোভাবের বৈশিষ্ট্যই এই যে কবিরা শব্দকে সংকেত ব'লে—প্রকাশের উপায় ব'লে মনে করেন না, শব্দকে বস্তু হিসাবে বিবেচনা করেন।.

কিন্তু শব্দকে নিছক বস্তুরূপে সাহিত্যে ব্যবহার করা কি সম্ভব? সার্ত্র বলছেন—না, এ কথা সত্য নয় যে লেখকের কাছে শব্দ সবটুকু অর্থ হারিয়ে ফেলে। অর্থহীন শব্দ নিছক শব্দমাত্রই, কলমের কতকগুলি আঁচড়মাত্র। আসলে অর্থই শব্দগুলিকে বাচনিক ঐক্য দান করে থাকে। কবির কাছে ভাষা হচ্ছে—Structure of the external world বাহ্যজগতেরই শিল্পগঠন। —বাগর্থের সম্পৃক্তি বা সাহিত্য। যে কবি বাক ও অর্থের মধ্যে যত সম্পৃক্তি বা সাহিত্য

ঘটাতে পারেন তাঁর বাগর্থ-প্রতিপত্তি তত বেশী, তিনি তত বড় কবি। সার্ত মনে করেন এই ভাষাকে—Structure of the external world বা the 'mirror of the world' এ পরিণত করতে হলে, কবিকে ভাষার বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে, ভাষাকে সংকেত হিসাবে গণ্য করলে চলবে না। বাইরে থাকেন বলেই কবি ভাষাকে পলাতকা বাস্তবসত্তাকে ধরে রাখার ফাঁদ বলে গণ্য করেন। তবে সব কিছু স্বীকার করার পরেও, সার্ত সাহিত্যকে নিরর্থক শব্দের সমাবেশ ব'লে মনে করেননি এবং তা করেননি বলেই—নির্বিষয় সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি এবং জোর গলায় এ কথা ঘোষণা করেছেন—'Art looses nothing by being committed, on the contrary just as physics submits to Mathematics new problems which require them to produce a new symbolism in like manner the always new requirements of the social and the metaphysical involve the artist in finding a new language and new techniques...মন্তব্যটি প্রণিধান-যোগ্য। শিল্পের পক্ষে উদ্দেশ্যহীন হওয়া যে সম্ভব নয় এবং শিল্প উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়েও যে সার্থক শিল্প হ'তে পারে এ বিষয়ে সার্তের মত খুব স্পষ্ট। আর একটি দিকেও লক্ষ্য করা দরকার। পদার্থতত্ত্ব যেমন গণিতের সামনে নতুন সমস্যা হাজির করে এবং গণিত নতুন সংকেত সৃষ্টি করে সমস্যার সমাধানে এগিয়ে যায় তেমনি সামাজিক ও দার্শনিক সমস্যা শিল্পীর সামনে নতুন সমস্যারূপ হ'য়ে দেখা দেয়, শিল্পী নতুন ভাষায় নতুন রীতিতে সেই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে—সামাজিক এবং দার্শনিক সমস্যা সাহিত্য-শিল্পীর চেতনাকে প্রভাবিত করে, সামাজিক তথা শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও দার্শনিক দ্বন্দ্ব সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। এই দিকে দৃষ্টি রেখেই সার্ত মন্তব্য করেছিলেন —বিশুদ্ধ শিল্প ও শূন্যগর্ভ শিল্প একই বস্তু। শৈল্পিক বিশুদ্ধতাবাদ গত শতাব্দীর সেই বুর্জোয়াদেরই একটি কৌশলপূর্ণ উদ্ভাবন, নাস্তিক বা অধার্মিক বলে অভিহিত হতে যাঁদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু ঘোর আপত্তি ছিল শোষকের দুর্নাম

নিতে। সাহিত্যের পক্ষে নিরর্থক কিছু হওয়া সম্ভব নয় সাহিত্য থেকে অর্থকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়, মুছে ফেললে সাহিত্য কতকগুলি নিরর্থক শব্দের ধ্বনি-পরম্পরায় আকাঙ্ক্ষা আসক্তিবিহীন শব্দের সমাবেশে পরিণত হয়, এ কথা প্রায় সকলেরই মনে হ'য়েছে। জনৈক বিখ্যাত শিল্পতত্ত্ববিদ লিখেছেন।—

কাব্য থেকে অর্থকে বাদ দেওয়ার একমাত্র উপায় নিরর্থক পদ বসিয়ে কবিতা রচনা করা, অ-পদ আবোল তাবোল রচনা করা। রাশিয়ায়—'ফিউচারিষ্ট"রা এবং আরো মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই চেষ্টা করেছিলেন। এই ধরনের "জাবেরওকি"—কবিতাকে সাহিত্য-সমালোচনায় কোন মূল্য দেওয়া হয়নি এবং যাঁরা এই ধরনের কবিতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা সকলেই ও পথ থেকে সরে এসেছেন। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে সংগীতের ক্ষেত্রে যেমনটি সম্ভব তেমনি শুধু শব্দধ্বনি দিয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্ভাবনা সাহিত্যে নেই।

"The only way to eliminate meaning entirely from poetry is to construct a poem of non-sense syllables of vocal noises which are not words—as was attempted by the Russian futurists and a very few others. The fact that no 'jaberwocky' poetry has even been judged by criticism to have literary importance and that all poets who have experimented with this kind of writing have abondoned it, sufficiently attests that there can be no significant possibility of beauty in word sound alone analogous to the beauty of music and entirely divorced from sense (২৬৪ পৃঃ এ. স্থাঃ ত্রি) এত ক'রে আমি সার্তের বক্তব্য উপস্থাপিত করলাম কেন, আশা করি তা সকলেই বুঝতে পেরেছেন। এ কথাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে—সাহিত্য যে উপাদান দিয়ে তৈরি হয় তার প্রকৃতিই এমন যে তা দিয়ে "বিমূর্ত শিল্প" সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

বিখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জন গ্যাসনার তাঁর "প্রোডিউসিং দি প্লে" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য একটি মন্তব্য করেছেন। তাঁর মন্তব্য এই যে বিমূর্ত সৌন্দর্য সম্বন্ধে যত আলোচনা হয় তা এই বিষয়টি এড়িয়ে যায় যে নাট্যকলা কোন-তেই বিমূর্ত হ'তে পারে না, নাটকের কাহিনী ও ভাব অতি বাস্তব বিষয়······যে মুহূর্তে কোন শিল্প সার্থক শব্দ ও জীবন্ত মানুষের জীবনকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে সেই মুহূর্তেই তার বিমূর্ত হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায় (**all discussion of abstract beauty always overlooks the fact that dramatic art is not abstract, that its stories and ideas are concrete ....the moment an art employs words and living people, it ceases to be abstract**)। বলা বাহুল্য এই মন্তব্য শুধু নাটক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তা' নয়, গীতিকবিতা গাথাকাব্য, খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, গল্প, উপন্যাস সবরকম সাহিত্য শিল্পের সম্বন্ধেই—এক কথায় ভাষা-শিল্প সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কোন কাব্যই—সে যে শ্রেণীর কাব্যই হোক—নিছক শব্দঝঙ্কার নয় নিরর্থক চমক অনুপ্রাসের সংকলন মাত্র নয়, শব্দ সুরতরঙ্গেই ভাসতে ভাসতে, দোল খেতে খেতে চলুক অথবা ছন্দোলয়ে পদচারণা করুক অথবা গদ্যের অনিয়ত ছন্দোযতিতেই শিথিল চরণে চলুক চলতে গেলেই তারা অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জনাশক্তি বলে অর্থ আক্ষিপ্ত করতে করতে চলে, উপায় নেই ব'লেই তা' করে। কারণ, সার্থক শব্দ বিশিষ্ট কোন মানবগোষ্ঠীর ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন বা চাহিদা থেকে উৎপন্ন ব'লে বিশেষ সমাজেরই সামগ্রী এবং সংকেতিত অর্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত বা সম্পৃক্ত। সাহিত্য থেকে অর্থকে মুছে ফেলার জন্য সাহিত্য শিল্পে বিমূর্ততা আমদানী করার জন্য যে চেষ্টা হ'য়েছে, তার সেরা নমুনা আবোল-তাবোল জাতীয় কবিতা ও এ্যাবসার্ড নাটকগুলি সমীক্ষণ করলেই তার নিষ্ফলতা বুঝতে পারা যাবে। অর্থের বন্ধন থেকে সংলাপকে মুক্ত করবার চেষ্টা ক'রে, পদের আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে পরিস্থিতিকে অসম্ভব ও উদ্ভট ক'রে তুলে এ্যাবসার্ড নাটকের নাট্যকারেরা

সম্পূর্ণ নিরর্থক রচনায় অনাসৃষ্টির যে নিষ্ফল চেষ্টা করেছেন, তাতেই প্রমাণিত হ'য়েছে—কোনও সৃষ্টিই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' হতে পারে না, সাহিত্যিকে অর্থহীন শব্দের সমাবেশে পরিণত করলে উদ্ভট কিছু একটা হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য হয় না। যাঁরা কবিতাকে 'বাচনিক সংগীত'-এ (Verbal music) পরিণত করবার অসাধ্য সাধনা করে গেছেন তাঁদের সাধনা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মিঃ বাওরা তাঁ'র "দি হেরিটেজ অফ সিম্বলিজম" গ্রন্থে (১৯৪৩) লিখেছেন—শব্দগুলি অর্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ সবচেয়ে সুরেলা ও ভাবব্যঞ্জক কবিতাও গীতিকারের সম্মান কেড়ে নে-ওয়ার আশা করতে পারে না।

মালার্মের ধারণা যে সত্য তা' প্রতিপাদিত করার অনেক চেষ্টা হয়েছে বটে কিন্তু যা ঘটেছে তা' তার বিরুদ্ধে চ'লে গেছে। শব্দকে যে অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এই অপরিবর্তনীয় সত্য এবং আরো সবকিছু এইটেই প্রমাণ করে যে তার ধারণা সত্য ছিল না।

[**Words are limited by their meaning. The most melodious and associative poetry can not hope to snatch his honours from the misicians. Attempts have been made to justify Mallarme's belief but the facts are against him .... the unalterable truth that words can not be divorced from their meanings, all these show that his doctrine was faulty.**]

মোট কথা কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার যে উপাদান দিয়ে কবিতা, উপন্যাস ও নাটক রচনা করেন সে হ'চ্ছে সার্থক শব্দ, অর্থাৎ এমন শব্দ যা, শুধু ধ্বনিটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, ধ্বনির গণ্ডী অতিক্রম ক'রে সর্বদাই অর্থে সংক্রামিত হয়, ইংরেজিতে বললে বলা যায় "**refers to something which is its referent**" সাহিত্যকে "**has to speak about something.**"

এখানেই প্রশ্ন উঠবে—সাহিত্য শব্দকে অর্থের সহিত বা একীভূত করতে চেষ্টা করে, অর্থকে দ্যোতিত করে, অর্থনারীশ্বরের মতো বাক্যকে অর্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত

করে—সার্তের ভাষায় 'structure of the external world পরিণত করতে চেষ্টা করে, অথবা ভাবের (states of the soul) সংকেতে পর্যবসিত করে, এ সবই না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু সাহিত্যকে যে "কোন-কিছু" বলতেই হবে—, commitment করতেই হবে বা conceptual 'thought' অর্থাৎ ধারণাকে ব্যক্ত করতেই হবে এমন কি কথা ? অলংকারবাদীরা বলতে পারেন, কাব্যে আমরা কোন কিছু বলতে চাইনে, শব্দালংকার ও অর্থালংকার প্রয়োগের দক্ষতা দেখাতে চাই, রীতিবাদীরা বলতে পারেন কবির কাজ বিষয়ের সাক্ষাৎকার ঘটানো নয় কবির আসল কাজ আনন্দজনক 'পদ সংঘটনা' সৃষ্টি করা ষ্টাইল সর্বস্ব ক্রিয়া-কৌশল দেখানো ; বক্রোক্তিবাদীরা বলতে পারেন—বক্রতার বৈচিত্র্য দেখানো, রসবাদীরা বলতে পারেন—বিশেষ একটা স্থায়ীভাবকে বিভাজনি ভাব-ব্যভিচারীভাব-সংযোগে আস্বাদনযোগ্য করে তোলা, এক কথায় ভাবের রূপ বৈচিত্র্য প্রকাশ করা, ধ্বনিবাদীরা বলবেন ব্যঞ্জনা শক্তির সাহায্যে বস্তু অলংকার ও ভাবকে অভিব্যঞ্জিত করা। আবেগবাদীরা বলবেন—সাহিত্যের কাজ বস্তুর বা ব্যক্তির রূপ উপস্থাপিত করা নয়, বস্তু বা ব্যক্তিকে আলম্বন করে ভাবাবেগকে প্রকাশ করা, মানুষের ভাবাবেগকে চরিতার্থ করা, কল্পনাবাদীরা বলবেন—সাহিত্যের কাজ রূপকল্প তৈরী করে মানুষের কল্পনাবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করা, সাহিত্য অন্যান্য চারুশিল্পেরই মতো মূলতঃ রূপকল্প বিশেষ, ভাষা দিয়ে মূর্তি গড়ারই বিশেষ প্রচেষ্টা।

সুতরাং সাহিত্যকে commitment করতেই হবে—কোন কিছু বলতেই হবে এ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে কি? যদিও প্রশ্নটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার, সে অবকাশ এখানে নেই, এখানে অতি-সংক্ষেপে এইটুকুই বলতে চাই যে সাহিত্যিক দার্শনিকের বা বৈজ্ঞানিকের মতো কোন conceptual thought বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন না এ কথা খুবই ঠিক, কিন্তু এ কথা আরো ঠিক যে সাহিত্যিক যে বিশেষকে ব্যক্ত করেন তা কোন-না-কোন সামান্যের ধারণারই বিশেষাশ্রিত মূর্তি ; অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার অনাসৃষ্টি নয়।

সবচেয়ে ছোট একটি কবিতা থেকে আরম্ভ করে মহাকায় মহাকাব্য অবধি যত বড় আয়তনের কাব্যই হোক না কেন, প্রত্যেকটি রচনার মূলে সংকল্প ও পরিকল্পনা বুদ্ধি কাজ ক'রে থাকে। এমন কি যেগুলিকে মনস্তাত্ত্বিক য়ুং 'ভিশনারী আর্ট' বলেছেন, যা কার্যতঃ নির্জ্ঞান ও সামষ্টিক নির্জ্ঞান মনের প্রেরণায় সৃষ্টি হয় সেগুলিও অপরিকল্পিত নয়। সেগুলিতেও নির্জ্ঞান ইচ্ছার প্রেরণায় রূপকল্পগুলি গড়ে ওঠে এবং পৌর্বাপর্য ক্রম রক্ষা করে অর্থবহ হয়ে উঠে। এমন কি পাগলামিও যে খাপছাড়া আচরণ নয়—there is reason in madness এ কথা সকলেই জানেন। সাহিত্যিকও রূপকল্পগুলিকে বিনা উদ্দেশ্যে বা বিনা পরিকল্পনায় স্থান অধিকার করতে দেন না এবং দেন না বলেই ঐ পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে পরোক্ষভাবে তাঁর বক্তব্যকে তিনি উপস্থাপিত করেন। ম্যাথ্যু আর্নল্ড সাহিত্যকে জীবন-সমালোচনা বলেছিলেন, নিশ্চয়ই এ অর্থে নয় যে সাহিত্য জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করবে, তাঁর মনে এই কথাটিই ছিল যে সাহিত্য, সে খণ্ড ভাবের অভিব্যক্তিই হোক অথবা জীবন সম্পর্কের ও পরিণামের রূপকল্পনাত্মক উপস্থাপনাই হোক, শেষ পর্যন্ত জীবনের নানা অবস্থাকে, চিত্তের নানা ভাব "States of soul" কে প্রকাশ করে এবং তা করতে যাওয়ার অর্থ—জীবনের সমালোচনা করা—দৃষ্টান্ত তৈরী করে পরোক্ষভাবে জীবনের তত্ত্ব ব্যক্ত করা। সার্ত বলেছেন—সাহিত্যিক এইভাবেই পরোক্ষভাবে 'message' প্রচার করেন এবং 'মেসেজ' হ'চ্ছে "soul which is made object"। মানুষ কি বিনা প্রয়োজনে তাঁর আত্মাকে দেখাতে যায়? কেউই বিনা প্রয়োজনে কিছু করে না, কথাই আছে—প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে। যেহেতু সার্তের ভাষায়—"it is not customary to show one's soul in society without a powerful motive—সাহিত্য রচনা এক প্রকার বিশেষ উদ্যোগ—is an enterprise। বাস্তবিকই—আদিম পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্যের যত নিদর্শন আমাদের সামনে রয়েছে, সেগুলির দিকে নজর দিলেই উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সত্যতা ধরা পড়া

সহজ হবে। কেউ যদি বলেন, কয়েকটি শব্দালংকার ও অর্থালংকার সৃষ্টি করার জন্তই বাল্মীকি রামায়ণ লিখেছিলেন, ব্যাস মহাভারত লিখেছিলেন, হোমার ইলিয়ড-ওডিসি লিখেছিলেন, দান্তে 'ডিভাইন কমেডি,' মিলটন 'প্যারাডাইজ লস্ট' কালিদাস তাঁর কাব্যগুলি, শেক্সপীয়র তাঁর নাটকগুলি লিখেছিলেন তা' হলে, নিশ্চয়ই আমরা তাঁকে সমর্থন করব না।

রীতিবাদী, বক্রোক্তিবাদী প্রভৃতি 'ফর্মালিষ্টদের সকলের সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। রসবাদীদের কথা শুনলে আপাততঃ এ কথা মনে হতে পারে, ভাবকে প্রকাশ করাই তথা আস্বাদ্য করে তোলাই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে কবির 'powerfull motive' ব্যক্ত হওয়ার অবকাশ কোথায়? ভাবের সঙ্গে সত্য শিব প্রভৃতি উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ কি? একথা ঠিক রসের আস্বাদন মূলতঃ ভাবেরই আস্বাদন, কিন্তু ভাব যে 'আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়' কোন কিছু নয়, রসের সংজ্ঞাটির মধ্যেই সে কথা বলা আছে। 'বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ রস-নিষ্পত্তি—ব্যাখ্যা করতে গেলেই দেখা যাবে রস সৃষ্টির জন্ম বিভাব অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব চাই, আলম্বনের কার্যাদি অর্থাৎ অনুভাব চাই এবং নানা সঞ্চারিভাব চাই। আলম্বন বিভাবকে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি পাত্র-পাত্রী যাদের অবলম্বন করে ভাব থাকে, উদ্দীপন বিভাবকে বলা যেতে পারে—পরিস্থিতি যাতে ভাব উদ্দীপিত হয়, অনুভাব পাত্র-পাত্রীর আচরণ এবং সঞ্চারিভাব মূল ভাবের পরিপোষক, নানা অনুকূল ও প্রতিকূল মানসিক অবস্থা। যে কথাটি সব চেয়ে বড় সে এই যে ভাব ব্যক্তিজীবনকে আশ্রয় করে থাকে, এবং তা থাকে বলেই ভাবের রূপ উপস্থাপিত করতে ব্যক্তি জীবনের পরিস্থিতি ও অবস্থা ও পরিণাম দেখাতেই হবে। ট্র্যাজেডি—কমেডির কথাই ধরা যাক। ব্যক্তিজীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাদ দিয়ে ট্র্যাজেডি, কমেডি, কোন রসই সৃষ্টি করা যায় না। ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে হ'লে জীবনকে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে একটা দুঃখাবহ পরিণামে শেষ করাতে হবে—ব্যক্তিজীবনের terrible doing বা terrible suffering-এর পরিণাম দেখাতে হবে। এই যে জীবনকে

ট্র্যাজেডির দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা অথবা কমেডির দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা, এই দেখা আসলে জীবনেরই প্রতি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী—বিশেষ ধরনের জীবনবোধ। যার সঙ্গে সত্যবোধ ও শিববোধ ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। রামায়ণ-মহাভারতের রসের কথাই ভাবা যাক। রামায়ণে করুণ রস নিষ্পন্ন মহাভারতে শান্তরস নিষ্পন্ন। রাম-সীতার সম্পর্কের মধ্যে বাল্মীকি প্রেম মূল্যের প্রতিষ্ঠা না করলে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তিনি করুণরস সৃষ্টি করতে পারতেন না, তেমনি মহাভারতেও ব্যাস জীবনের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের উপরে শমভাবের প্রতিষ্ঠা দিয়ে ধর্মকেই বা শ্রেয়কেই জীবনের কাম্য ব'লে প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। মোট কথা এই, জীবন সমালোচনা না ক'রে রসসৃষ্টি করা সম্ভব নয় এবং সম্ভব নয় এই কারণেই যে ভাব জীবনকে আশ্রয় করে থাকে, জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ভাবের জাগরণ ও উত্থান এবং জীবনের বিশেষ পরিণামে ভাবের পরিক্রমা বা নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ হয়। তা'হলে দেখা যাচ্ছে সাহিত্য, শব্দ বাহ্য জগতের বিষয়ে বিপরিণত হয়। শব্দার্থের সাহিত্য ঘটে বিশেষের (particular) রূপ তৈরী হয়—এ কথা যেমন সত্য, এ কথাও তেমনি সত্য যে ঐ বিশেষই ব্যঞ্জনা বলে সাহিত্যিকের জীবনবোধের ভাবা হ'য়ে উঠে, পুরুষার্থপ্রীতির নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবিকই শিল্পী জীবনকে দশের সামনে তুলে ধরছেন অথচ জীবন সম্বন্ধে কিছু বলছেন না; বলছেন অথচ জীবন সমালোচনা করছেন না; সমালোচনা করছেন অথচ জীবনকে পরিবর্তিত করতে চাইছেন না, এ সম্ভব নয়। শিল্পীরা জানেন—সার্ত্রের ভাষায় বলা যেতে পারে—প্রকাশিত করা মানেই পরিবর্তন ঘটানো এবং একমাত্র পরিবর্তন ঘটানোর উদ্দেশ্যেই কেউ কোন কিছু প্রকাশিত করতে পারে। সমাজের এবং মানুষের অবস্থার অপক্ষপাতী ছবি আঁকার অসম্ভব স্বপ্নকে সে পরিত্যাগ করেছে। মানুষ এমন এক জীব যার প্রতি কেউই অপক্ষপাতী হতে পারে না।"

"That to reveal is to change and that one can reveal only by planning to change. He has given up that impossible dream of giving an impartial picture of society and the

human condition. Man is the being towards whom no being can be impartial. (১৩ পৃঃ সাহিত্য কি ?)

সাহিত্য এক হিসাবে যেমন জীবনের প্রদর্শন, জীবনের উদ্ভাসন, আর এক হিসাবে আবেদন (appeal) এবং আবেদন বলেই—"the work of art is a value।" এই উক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সার্ত লিখেছেন—"কোন লেখকই নিজের জন্য লেখেন না, পাঠকের মুখ চেয়েই লেখেন, পাঠকদের কিছু দেখাতে বা বলতে চান ব'লেই লেখেন। যেহেতু কোন রচনা চরিতার্থ হয় পঠনে, যেহেতু স্রষ্টা তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করার জন্য অন্যের উপরে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য, যেহেতু একমাত্র পাঠকেরই চেতনার মাধ্যমে তিনি কবি কর্মের সার্থকতা খুঁজে পান সেইহেতু সব সাহিত্যই হচ্ছে—"আবেদন"—পাঠকের মুক্তি চেতনার কাছে আবেদন। এই ভাবেই…"at the heart of the aesthetic imperative we discern the moral imperative for, since the one who writes recognizes by the very fact that he takes the trouble to write, the freedom of his reader and since the one who reads by the mere fact of his opening the book recognizes the freedom of the writer, the work of art from whichever side you approach it, is an act of confidence in the freedom of men."

শৈল্পিক দায়িত্বের মধ্যে আমরা নৈতিক দায়িত্বকেও দেখতে পাই। কারণ, যেহেতু যিনি লেখেন, লেখার পরিক্রম করতে গিয়েই তিনি পাঠকের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেন, এবং যেহেতু যিনি পাঠ করেন বই খুলে পড়ার উদ্যোগ করার ভিতর দিয়েই তিনি লেখকের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন; যেদিক থেকেই শিল্পকর্মটিকে দেখা হোক, শিল্পসৃষ্টি মানুষের স্বাধীনতার উপরে আস্থা স্থাপন করা। মানুষের স্বাধীনতা বা মুক্তি বলতে কি বুঝায় তার ধারণা যত স্পষ্ট হবে, বলা বাহুল্য, শিল্পীর দায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণাও তত স্পষ্ট হবে। মুক্তি সাধনা বলতে বুঝায় 'সত্যের আবরণ উন্মোচন করে সত্যবোধকে স্পষ্টতর করে তোলা, জীবন-সম্পর্কের

আদর্শকে জীবনে বাস্তব করে তোলবার জন্য সব বাধা অপসারণ করা—রাজনৈতিক সম্পর্কে স্বাধীনতা, আর্থনৈতিক সম্পর্কে সাম্য, সামাজিক সম্পর্কে মৈত্রী এবং পারিবারিক সম্পর্কে প্রেম-ভক্তি-স্নেহ প্রভৃতি মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা। প্রত্যেক সামাজিক মানুষের মধ্যেই মুক্তির আবেগ বেশী কম স্তিমিত অথবা উদ্দীপিত রূপে বর্তমান থাকে, কারণ সামাজিক জীবন মানেই—মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত জীবন; লেখক বা পাঠক উভয়েরই জীবন সামাজিক জীবন, উভয়েই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং উভয়েরই মূল্য চেতনা ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি থেকে জন্মলাভ করে থাকে। তাই লেখকের রচনায় তার মানসিক অভিপ্রায় "সামাজিক বিধিব্যবস্থা, রীতি-নীতি, বিশেষ ধরনের অত্যাচার, অবিচার, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমসাময়িককালের অভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা, স্থায়ী আবেগ, অস্থায়ী একগুঁয়েমি, কুসংস্কার, সাধারণ বুদ্ধির সাময়িক জয়, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষ ধরনের যুক্তি, আশা, ভয়, স্পর্শপরতা, কল্পনা, প্রথা এবং সাধারণ মূল্যবোধ—সবকিছুই প্রচ্ছন্নভাবে মিশে থাকে।" (there is an implicit recourse to institutions, customs certain forms of oppression and conflict, to the wisdom and folly of the day, to lasting passions and passing stubborness, to superistition and recent victoriesof commonsense, to evidence and ignorance, to particular modes of reasoning which the sciences have made fashionable and which are applied in all domains to hopes, to fears to havits of sursibilities, imagiation and even perception, and finally to customs and values which have been handed down to a whole world which the auther and the reader have in common—50 page) কেন সাহিত্যে এগুলি মিশতে বাধ্য, কেন সাহিত্য অর্থময় হ'তে বাধ্য আরো একটু তলিয়ে দেখা যাক। আগেই বলা হ'য়েছে সাহিত্য বলতে আমরা নিরর্থক শব্দের ধ্বনি পরম্পরা বুঝিনে সাহিত্য বলতে বুঝি এমন কোন বাচনিক সংস্থা যা বিশেষ অর্থকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট হয়।

সাহিত্য শব্দার্থের এক সমন্বিত ক্ষেত্র, এক বাচনিক ঐক্য (Verbal unity) যা'তে অর্থকে কেন্দ্র ক'রে শব্দ বাচনিক ঐক্য অর্জন করে। "এ এক পরম্পরিত শব্দ বিন্যাস যেখানে বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাণুগুলি মিলিত হ'য়ে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থের সৃষ্টি করে। অণুগুলির সংযোগে যে অর্থ সৃষ্ট হয় তারা বৌদ্ধিক চিন্তার অংশ অথবা কল্পনাত্মক চিন্তার অংশ (যাদের সময় সময় মানসিক ছবি বলা হয়) অথবা ভাবাবেগের রূপকল্পান্বিত প্রকাশ হতে পারে।" (২৬' পৃষ্ঠা এ, এ্যাঃ ক্রিঃ) বাস্তবিকই মূল অর্থটিই সেই কেন্দ্র-শক্তি যা' সব কিছু শব্দার্থকে নিজের বক্ষের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে রেখে সার্থকতা দান করে। বেন জনসনের উক্তিটি স্মরণীয়, তিনি বলেছেন "In all speech, words and sense are as the body and the soul. The sense is as the life and soul of language without which all words are dead." বাক্যে শব্দ ও অর্থ যেন দেহ ও আত্মা; অর্থ হচ্ছে ভাষার প্রাণ ও আত্মা, যার অভাবে শব্দরাজি মৃত। মূল অর্থ বা প্রধান অর্থ বলতে আমি বুঝাতে চাইছি সেই উপস্থাপ্য বিষয়টি, সেই অখণ্ড অর্থটি (totality of the whole) খণ্ড খণ্ড অর্থের সংযোগে যাকে সাহিত্যিক সংগঠিত করতে সঙ্কল্প করেছেন। শিল্পীর উদ্দেশ্য ব'লতে আমরা যদি অসংলগ্ন ধ্বনিঝঙ্কার, রূপকল্পরচনা বা ভাবনার সমষ্টি না বুঝি তাহ'লে কবি-সমালোচক এজরা পাউণ্ডের ভাষায় বলতেই হবে—"The aim of technique is that it establish the totality of the whole." বহু আগেই এ কথা বহুজনে বলেছেন—প্রত্যেক শিল্পবস্তুই এক একটি ব্যক্তির মত স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সামগ্রী—এরিষ্টটলের পরিভাষায় বললে—'complete and whole।' এই যে শিল্পবস্তুর আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত সমগ্রতা, সর্বাঙ্গীণ ঐক্য, এ ঐক্য কাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠে? নিশ্চয়ই শব্দকে আশ্রয় করে নয়। শব্দের সঙ্গে শব্দের ধ্বনিগত অন্বয়ের ভিত্তিতে হয়তো সংগীত তৈরি হতে পারে, ধ্বনিমাধুর্যকে সাহিত্যকর্মের অন্যতম গুণ ব'লেও গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোন সাহিত্যই নিছক ধ্বনিমাধুর্য নয়, বা বিচ্ছিন্ন কল্পনা অথবা অসংলগ্ন

বিজল্পনা নয় ; ঐ সব কিছুর সমবায়ে একটি মূল অর্থে পৌছানোর চেষ্টা, যাকে আমরা বলতে পারি—"Enforming of meanings into aesthetic wholes"—অর্থ সমূহের সমবায়ে শৈল্পিক সামগ্রী তৈরি করা।
যে যে মূল উপাদানে সাহিত্য তৈরি হয় তাদের তিন শ্রেণীতে কবি এজরা পাউণ্ড ভাগ করেছেন এবং "মেলোপোইয়া" "ফেনোপোইয়া" এবং "লোগোপোইয়া" এই তিন নাম দিয়েছেন। মেলোপোইয়া বলতে বুঝায় শব্দ-সৌন্দর্য বা ধ্বনিমাধুর্য, ফেনো-পোইয়া বলিতে বুঝায় "Throwing of visual image on the mind" মনশ্চক্ষুতে রূপ প্রতিভাত করানো। কেউ কেউ এই শব্দটিকে একটু ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং সেই অর্থটি হল "presentation to awareness of a perceptual or an emotional situation" অর্থাৎ চেতনার কাছে প্রতীতিগত বা আবেগগত অবস্থাকে উপস্থাপিত করা। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা যায়—চিত্রতাকরণ (visualization) এবং 'লোগোপোইয়া' বলতে বুঝায়—মননের পরিস্থিতির অথবা চিন্তার মাধ্যমে আবেগের উপস্থাপনা।

সাধারণ মনন বা শাস্ত্রীয় মনন থেকে শৈল্পিক মনন এখানেই পৃথক যে শৈল্পিক মনন ভাবানুভূতির সঙ্গে চরিত্রের মনোভাবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। শৈল্পিক মনন রসনিষ্পত্তির উপাদান বহুভাবের মধ্যে অন্যতম একটি সঞ্চারিভাব—যার নাম 'চিন্তা'। বেনিডেট্টো ক্রোচে এ সম্বন্ধে যা' বলেছেন তা' উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন আধুনিক মানুষের প্রতিভানের মধ্যে অনেক সংজ্ঞা বা চিন্তা সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে,—These concepts which are found mingled and fused with the intuitions are no longer concepts...for they have lost all independence and autonomy. They have been concepts but have now become simple elements of intuition. The philosophical maxims placed in the mouth of a personage of tragedy or comedy perform there the function, not of concepts but of chara-

cteristics of such personage." অর্থাৎ ঐ সংজ্ঞা বা ধারণাগুলি প্রতিভানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে, প্রতিভানের মধ্যে লীন হয়ে থাকে বলে, তখন আর ধারণা থাকে না, তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। আগে তারা 'ধারণা' রূপেই ছিল, কিন্তু এখন প্রতিভানের উপাদান বিশেষ ট্র্যাজেডির বা কমেডির পাত্রপাত্রীর মুখে যে দার্শনিক উক্তি দেওয়া হয়, সেগুলি তত্ত্বমাত্র নয় ঐ পাত্রপাত্রীরই চরিত্রবৈশিষ্ট্য।

সুতরাং কাব্যে মেলোপোইয়া, ফেনোপোইয়া ও লোগোপোইয়া, যাই থাক না কেন, কাব্যদেহ গঠনের উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়, তাদের কোনটি এককভাবে অথবা সবকটি সমষ্টিগতভাবেও কাব্যপুরুষ নয়। যে ঐক্য কাব্যকে ব্যক্তিত্ব দান করে তা' নিহিত থাকে, কাব্যের উপস্থাপ্য বিষয়ের বা ভাবের ঐক্যের মধ্যে—"in the unity of the experience which the work of art presents"। এ সম্পর্কে হ্যারোল্ড ওসবোর্ণ লিখেছেন—"The components of the total experience are not externally linked but interact organically react and response by mutual influence, are each determined for what they are by the interplay of all the other parts and by the whole of which they are parts and which they together compose, as the parts of an organic whole—(২৬৮ পৃ: এঃ এ্যাঃ ক্রি—,)। প্রাণিজগতের অভিজ্ঞতায় যেমন অঙ্গীর প্রকৃতি না জানলে অঙ্গ-যোজনার রীতি জানা যায় না, তেমনি শিল্পের জগতেও, অঙ্গীর বা মুখ্য প্রতিপাদ্যের বা বিষয়বস্তুর স্বরূপ না জানা পর্যন্ত অঙ্গবিন্যাসের সার্থকতা-অসার্থকতা বিচার করা সম্ভব নয়। যে-কোন একটি কবিতার, গল্পের, উপন্যাসের বা নাটকের গঠনের কথাই ধরা যাক। কোথায় আরম্ভ এবং কোথায় শেষ হবে, আদিতে মধ্যে এবং অন্তে কি থাকবে সব কিছু নির্ভর করবে উপস্থাপ্য বিষয়ের প্রকৃতির উপরে। এই মন্তব্যের সত্যতা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাবার কোন প্রয়োজন

আছে ব'লে আমি মনে করিনে। যে-কোন একটি কবিতা বা গল্প বা উপন্যাস বা নাটকের দিকে চাইলেই দেখা যাবে বিষয়বস্তুর বা উপস্থাপ্যের প্রকৃতিই তার গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, তার গঠনে যে আঙ্গিক অন্বয় বা ঐক্য দেখা দিয়েছে তা' এসেছে অঙ্গীর বা মূলগতভাবের স্বরূপ থেকেই। বাক্যের সঙ্গে বাক্যের যোগে যে মহাবাক্য গড়ে উঠেছে, তা' কতকগুলি খাপছাড়া বাক্যের সমষ্টি নয় যেমন পদের পরে পদ বসে যে বাক্য তৈরি হয় তা' কোন আকাঙ্খাহীন, আসক্তিহীন পদের সমষ্টি নয়। মহাবাক্যে খণ্ড খণ্ড বাক্যগুলির ক্রম নিয়ন্ত্রিত করে কে? নিশ্চয়ই মহাবাক্য যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত শরীর সেই শরীরী বিষয়বস্তুটিই ইংরেজিতে যাকে বলে 'theme' অথবা premise অথবা root-idea। তা' হ'লে একথা স্বীকার করতেই হবে—রূপের বিষয়নিরপেক্ষ কোন মূল্য নেই বিষয়ই রূপের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের মানদণ্ড এবং রূপের "অর্গানিক ইউনিটি" নিরপেক্ষ বা স্বয়ংনির্ভর কোন কিছু নয় এবং এই কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই যা' স্বীকৃত হবে তা' এই যে, সাহিত্য-শিল্পের সমালোচনা referentialist হ'তে বাধ্য আর বিষয়বস্তুই হ'চ্ছে সেই 'referent যাকে রূপটি প্রকাশ করে থাকে। এ বিষয়ে পরে আরো বিশদ আলোচনা করা যাবে। এখন, এই সিদ্ধান্তেরই অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত শিল্প নিছক কলা-কৌশলমাত্র নয়, সাহিত্যে সাহিত্যিকের মনোভঙ্গী তথা বিশেষ মূল্য বোধই ব্যক্ত হয় এই মতবাদটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

এই মতের বিপরীত মত হ'চ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে art for art's sake, এবং বাংলায় যা কলাকৈবল্যবাদ নামে প্রচলিত। এই মতবাদটির বক্তব্য সংক্ষেপে এই শিল্পের একমাত্র মূল্য শৈল্পিক মূল্য—এবং ঐ মূল্য আসলে রূপ-মূল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। শিল্পের বিচারে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব লঘুত্ব বিচার অবান্তর। এই মতবাদ যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের কাছে শিল্প অমৃত বা বিষ নয়, শিল্প হ'ল মদ এবং আনন্দমূল্য ও সৌন্দর্যমূল্য

ছাড়া শিল্পের আর কোন মূল্যই নেই। একদিকে শিল্পকে বিষয়ের প্রকাশ রূপে দেখা তথা বিষয়-গৌরব ও রূপমূল্য দু'দিকেই দৃষ্টি রেখে বিচার অন্যদিকে শিল্পের রূপমূল্যকে বা সৌন্দর্যমূল্যকে বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে সামঞ্জস্য, সুষমা, সমন্বয় প্রভৃতি গুণের মধ্যে রূপ-মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করা—এই দুই প্রবণতার ইতিহাস খুব আধুনিককালের ইতিহাস নয় বটে, কিন্তু প্রবণতাকে মতবাদে পরিণত করার চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীতেই সংলক্ষ্য রূপ গ্রহণ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ফ্রান্সে, মতবাদটি মাথা তুলতে আরম্ভ করেছিল। ভিক্টর হুগো ১৮২৯ খ্রীঃ এই ধারণাটি প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টর কুঁজা 'লা আর্ত পিয়োর লা 'আর্ত' বা বিশুদ্ধ শিল্পের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। থিয়োফিলে গোঁতিয়ে —যিনি প্রথম দিকে চিত্রকর পরে লেখক হয়েছিলেন—কলাকৈবল্যবাদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মতে শিল্প অ-নৈতিক (amoral)। গোঁকু ভ্রাতৃগণ, রেনান, ফ্লচা (মৃত্যুর দশ বছর আগে তিনি মোহমুক্ত হয়ে লিখেছিলেন—"An aesthetico-moral theory—the heart is inseparable from the intelligence. Those who have drawn a line between the two, possessed neither"), বোঁদলেয়া—(যাঁর মন্তব্য 'কাব্যের উদ্দেশ্য কাব্যই, কবি যদি কোন নৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে যান তা' হ'লে বুঝতে হবে—তার কবিপ্রতিভা হ্রাস পেয়েছে এবং তার ফল খারাপ হবেই।") আরো অনেকে এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক হ'য়েছিলেন। ইংলণ্ডেও কলাকৈবল্যবাদীর সংখ্যা নগণ্য ছিল না। উইলিয়াম পেটার ছিলেন এই যুদ্ধের এক বড় সেনাপতি। অধ্যাপক ব্র্যাডলের "অকসফোর্ড লেকচারস্ অন পোয়েট্রি"—গ্রন্থের প্রারম্ভিক ভাবণটি—"পোয়েট্রি ফর পোয়েট্রি'স্ সেক"—"কাব্যের জন্যই কাব্য" এই মত প্রচারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। ব্র্যাড্লের সিদ্ধান্ত—"The consideration of ulterior ends, whether by the poet in the act of composing or by the reader

in the act of experiencing, tends to lower poetic value. It does so because it tends to change the nature of poetry by taking it out of its own atmosphere for its nature is to be not a part or copy of the real world, but to be a world by itself independent, complete, autonomous" অর্থাৎ কবির মনে কোন উদ্দেশ্য বড় হয়ে থাকলে শিল্প মূল্য কমে যায়—কাব্যের সম্বন্ধে এ ধারণা আমাদের দেশে বহু আগেই দেখা দিয়েছিল। কাব্যের জগৎ নিয়তিকৃত নিয়মের অধীন নয়, হ্লাদৈকময়ী, অনন্যপরতন্ত্রা, অপার কাব্য সংসারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি, তাঁর রুচিই ও কল্পনাই সৃষ্টির একমাত্র নিয়ামক—এ ধরনের উক্তি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। তেমনি এ কথাও পাওয়া যায়—কাব্যং যশসে অর্থকৃতে শিবেতরক্ষত যে কান্তাসম্মিত তয়োপদেশযুজে ··। যাই হোক পক্ষে বিপক্ষে সারা দুনিয়ার মত কুড়িয়ে সময় নষ্ট না করে—এই কথাটিই আপনাদের জানাতে চাই, যে সাহিত্যে ইতিহাসের সাক্ষ্য নিতে গেলে দেখা যাবে—সাঁর্তের কথাই ঠিক, সাহিত্য কখনও বিশুদ্ধবাদীদের পক্ষ সমর্থন করেনি —Art has never been on the side of the purists।" বিশুদ্ধকলাবাদীদের সাঁর্ত কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছেন। তাঁর মন্তব্যটি উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না—"আমরা ভাল করেই জানি যে বিশুদ্ধ শিল্প এবং শূন্যগর্ভ শিল্প একই বস্তু; শৈল্পিক বিশুদ্ধতা গত শতাব্দীর বুর্জোয়াদেরই অতি চমৎকার একটি চক্রান্ত, ঐ বুর্জোয়ারা এইটেই দেখতে চেয়েছিলেন যে লোকে তাঁদের অধার্মিক ব'লে নিন্দা করে করুক কিন্তু শোষকের দুর্নাম যেন না দেয়।" মন্তব্যটি কড়া এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মন্তব্যটি মিথ্যা সে কথা বলা যায় না। যখনই শ্রেণী দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের মূল্য চেতনার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে —মনে প্রাচীন মূল্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে, নতুন নতুন দ্বন্দ্বের দিকে

প্রগতিকামী শিল্পীরা এগিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছেন, তখনই দেখা যায় প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পীরা ও শিল্পতত্ত্ববিদরা, শিল্পের বিশুদ্ধ শৈল্পিক মূল্যের গুণগান করতে উঠেপড়ে লেগেছেন শিল্পকে সত্য মূল্যের শিবমূল্যের স্পর্শ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন, এক কথায় শিল্পকে উদ্দেশ্যমুক্ত করে রাখার জন্য, শিল্প যাতে নতুন মত প্রচারের বাহন না হয়, শিল্পকে যা'তে কেউ বৈপ্লবিক চিন্তা ও আবেগ সঞ্চারের তথা শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত না করে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। আমার ধারণা, কলাকৈবল্যবাদীদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যেদিন কলাকৈবল্যবাদের নিখুঁত ইতিহাস লিখিত হবে, সেদিন এই কথাটাই হয়তো সত্য হয়ে উঠবে, কলাকৈবল্যবাদীরা যতটা নতুন মূল্যবোধের বা বক্তব্যের ভয়ে ততটা শিল্পানুরাগে কলাকৈবল্যবাদ সমর্থন করেননি এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাটাও স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে যে কলাকৈবল্যবাদীদের শিল্প উদ্দেশ্যহীন নয়, বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাঁরা তাঁদের রচনার উদ্দেশ্যকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিকালের একদল কলাকৈবল্যবাদী শিল্পীর 'উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্যে'র দিকে নজর রাখলেই বুঝতে পারা যাবে—শিল্পকে উদ্দেশ্যমুক্ত করার নামে তাঁরা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছেন, কেন তাঁরা পঙ্ককে পঙ্কজ বলে চালাতে কোমর বেঁধে লেগেছেন, বিশেষ জীবের মতো 'পল্বল পঙ্কে' নিমজ্জিত হ'য়ে আছেন এবং গা ঝাড়া দিয়ে পরিবেশকে পঙ্কিল করে তুলছেন।

'উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্য' কথাটি কেন ব্যবহার করছি নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কলাকৈবল্যবাদীই হোন আর বিষয়বাদীই হোন, সাহিত্যকে উদ্দেশ্যহীন করে তোলায় শক্তি কারোই নেই এবং নেই এই কারণে যে সাহিত্য শুধু শব্দের সমাবেশ নয়, অথবা অসংলগ্ন কতকগুলি সার্থক শব্দের কৌশলপূর্ণ বিন্যাস মাত্র নয়, সাহিত্য সার্থক শব্দের একটি ঐক্য-ক্ষেত্র, যার ঐক্য—"originates in the unity of experience"

—সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকেই উৎপন্ন হয়। এই সামগ্রিক অভিজ্ঞতাটিকেই বিষয়বস্তুর রূপ বলা হয়ে থাকে এবং সেই দিক থেকে সাহিত্য কোন-না-কোন বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করবেই এবং সাহিত্যের পক্ষে বিমূর্ত হওয়া কোন-ভাবেই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি এবং এই কথাটিই আপনাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করেছি যে সাহিত্যকে absolutist দৃষ্টিভঙ্গীতে সমালোচনা করা সম্ভব নয়—সাহিত্য সমালোচনাকে নিছক ছন্দ, অলংকারের বা মেলোপোইয়া, ফেনোপোইয়া এবং লোগোপোইয়া আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা চলে না এবং চলে না এই কারণেই যে, যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে সাহিত্য প্রকাশ করতে চায় তার প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের রূপকে—রূপের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে।

এখানে আকার (ফর্ম) এবং বিষয়বস্তুর (কন্‌টেন্ট্) সম্পর্ক সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চৈতন্যবাদী বা ভাববাদী দার্শনিকরা বস্তুকে বিষয় এবং আকার নামক দু'টি স্বতন্ত্র পদার্থের সংযোগের ফল বলে মনে করে থাকেন এবং আকারকে বিষয়নিরপেক্ষ মর্যাদা দিতে বাধ্য হন, কারণ আকার—ইংরাজিতে যাকে বলা হয় 'আইডিয়া'—বস্তু থেকে শুধু পৃথকই নয়, বস্তুজগতের ভিত্তি হিসাবে বস্তুজগতের পূর্ববর্তী সত্তা। এই হিসাবে 'আকার' মনেরই অন্তর্নিহিত স্বতন্ত্র সংস্কার, বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন বা আগত কোন কিছু নয়। ক্রোচের ভাষায় 'ফর্ম' আত্মিক ক্রিয়া বিশেষ এবং "form is constant" শিল্পে আকারের ও বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার প্রসঙ্গে ক্রোচে প্রশ্ন করছেন—শিল্পকর্মটি কি শুধুই আকার? অথবা শুধুই বস্তু? অথবা আকার ও বস্তুর সংযোগ? ক্রোচের উত্তর—শিল্প শুধু বিষয়বস্তু অথবা আকার ও বস্তুর যোগফল নয়, শিল্পকর্মে প্রত্যয়রাজি (ইম্প্রেশানস) আত্মিক ক্রিয়া দ্বারা সংগঠিত ও বিস্তারিত হয়। শিল্পকর্ম এই দিক থেকে রূপবিশেষ এবং রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রোচের উল্লিখিত মন্তব্য বিষয়বস্তুকে অতিগৌণ এবং আকার

বা রূপকেই একেশ্বর করে তুলেছে এবং রূপকল্পের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারে বিষয়ের কোন অপেক্ষা রাখে নি। যদিও ক্রোচেকে স্বীকার করতে হয়েছে—"It is the matter, the content which differentiates one of our intuitions form another." বিষয়বস্তুর গুরুত্ব লাঘব করবার জন্যই ক্রোচে—"কনটেন্ট্"-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—"content is that which is formed" অর্থাৎ যা আকারায়িত হয় তারই নাম বিষয়বস্তু। ক্রোচের "আকার"-ভক্তি চরমে পৌঁচেছে যেখানে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই শিল্পবিচারের মানদণ্ড করেছেন—"intuitive absoluteness of imagination" এবং বিষয় সাপেক্ষতা সম্পূর্ণ পরিহার করেছেন। বলা বাহুল্য, ক্রোচের প্রতিভানবাদের অতি স্বাভাবিক পরিণাম—কলাকৈবল্যবাদ—বিষয় নিরপেক্ষ রূপ-রীতি অন্যপক্ষে, বস্তুবাদী দার্শনিকরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আকার ও বিষয়বস্তুর সম্পর্কটি দেখেছেন। বস্তুকেই তাঁরা প্রাথমিক বা পারমার্থিক সত্তা বলে মনে করেন এবং চৈতন্যকে বস্তু থেকে উদ্ভূত ভিন্নধর্মী বস্তু বলে—মননক্ষম বস্তু বলে মনে করেন। কিন্তু এঁদের মতে জ্ঞান বিষয়েরই জ্ঞান এবং মনে যে সব সংস্কার বা প্রত্যয় জন্মে সবই বিষয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আসে বিষয়ের ধর্মরূপেই সেগুলি মনে সঞ্চিত হয়। ভাববাদীরা মনে করেন—জ্ঞানের ব্যাপারে মন নিজের ভিতর থেকে অনেক কিছু—ক্যাটিগোরি নামে যেগুলি পরিচিত সেই গ্রহণ-রীতিগুলি দান করে থাকে, কিন্তু বস্তুবাদীরা ঐ ক্যাটিগোরিগুলির অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষতা স্বীকার করেন না। এখানেই উভয়ের ধারণার অন্যতম মৌলিক পার্থক্য। বস্তুবাদীদের কাছে বস্তু ও বস্তুরূপ অবিচ্ছেদ্য, আকার বস্তুরই স্বরূপ। একথা ঠিক বটে There is no content in general but only formed content is content which has a definite form. কিন্তু এ কথা আরো ঠিক there is no pure form without any content. Form always has content, it presupposes a definite content whose structure or organisation it represents. Content determines

form (মার্কসিস্ট ফিলোসফি : ভিঃ এফানাসাইভে)। এই শেষোক্ত বাক্যটি স্মরণীয়। আকার বা রূপকে বিষয়নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া এবং বিষয়বস্তুকে রূপের নিয়ন্তা বলে মনে করা—দুই ভিন্নকোটিক ধারণা। যে মতবাদ রূপকে বস্তুসাপেক্ষ বলে মনে করে—বিষয়বস্তুকে রূপের নিয়ামক ব'লে ঘোষণা করে, সেই মতবাদ রূপের বিচারকে বস্তুসাপেক্ষ না করে—রেফারেন্শিয়ালিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করে পারে না। কারণ বস্তুস্বরূপের ধারণা না থাকলে রূপের (ফর্ম) প্রকৃতি নির্ধারণ যাথার্থ্য বিচার করা সম্ভব হবে কি করে? হ্যারোল্ড ওসবোর্ণ মহাশয় কনফিগারেশানবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেও (কনফিগারেশান-বাদীদের অনেকেই নৈর্ব্যাক্তিক রূপবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন তা আগেই বলা হয়েছে) বিষয়বস্তু ও রূপের মধ্যে বিচ্ছেদ কল্পনা করেননি এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটিয়েও যে "কনফিগারেশানাল ক্রিটিসিজিম"-এর পন্থা গ্রহণ করা সম্ভব সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন—There can be no conflict between form and content in configurational criticism for neither has existence without the other and abstraction is murder to both [এস্থেটিকস এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজিম্ (২৮৯ পৃঃ)] কথাটি প্রণিধানযোগ্য। বিষয়বস্তু ও রূপের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালে উভয়কেই হত্যা করা হয়। হ্যারোল্ড্ ওসবোর্ণ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সত্য ব'লে মেনে নিলে, শেষ পর্যন্ত এই কথাই স্বীকার করতে হবে যে শিল্পের অবয়ব-সংস্থান যাই থাক, তা আসলে এক সামগ্রিক অভিজ্ঞতারই ব্যক্ত রূপ অর্থাৎ অংশের সংযোগে যে সমগ্র তৈরী হয়ে উঠে তা বিষয়বস্তুনিরপেক্ষ কিছু নয়—তা রূপবহির্ভূত কোন কিছুর অর্থাৎ অর্থের দ্যোতক—প্রতিপাদক। রূপকে যাঁরা পারমার্থিক (এ্যাবসোলিউট) ব'লে মনে করেন, সেইসব কনফিগারেশানবাদীদের সঙ্গে ওসবোর্ণের পার্থক্য সুস্পষ্ট। তাঁদের কাছে—শিল্পবহির্ভূত কোন পদার্থের সঙ্গে শিল্পের কোন সম্পর্ক মূল্য নেই, শিল্পের মধ্যেই শিল্পের শেষ এবং শিল্পে যে অন্তর্জাদিত্যোগ বিরাজ করে তার মূল্য

নির্ধারণে বিষয়বস্তুর কোন ভূমিকা নেই। শিল্পের আঙ্গাঙ্গিসম্পর্কের মূল্য বিচারে, মনোযোগ অঙ্গী ও অঙ্গের মধ্যে দোলকের মত দুলতে থাকে, অঙ্গীর রূপটির সঙ্গে অঙ্গের সঙ্গতির হিসাব করতে করতে, অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক নিরূপণ করতে করতে মন এগিয়ে চলে—(২৫৮ পৃষ্ঠা) এ'কথা রেফারেনশিয়ালিষ্ট (বস্তুসাপেক্ষ-বাদী) এবং এ্যাবসোলিউটিস্ট (বস্তুনিরপেক্ষবাদী) উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য হ'তে পারে; কিন্তু উভয়পক্ষে একই অর্থে প্রযোজ্য সে কথা বলা যায় না।

আমার কথাটি একটু ভেবে দেখতে বলছি। ধরা যাক এরিষ্টটলের কথা। সকলেই জানেন—তিনি ছিলেন অনুকরণবাদী অর্থাৎ তাঁর মতে শিল্প অনুকৃতি-করণ। কিন্তু অনুকরণবাদী হওয়া এবং শিল্পে "অর্গানিক ইউনিটি" চাওয়া স্বতোবিরুদ্ধ কোন ব্যাপার নয় ব'লেই, তিনিই প্রথম 'অর্গানিক ইউনিটিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তের লক্ষণ ব'লে নির্দেশ করেছিলেন. নাটক অনুকরণ তবে কার অনুকরণ? লোকবৃত্তের অনুকরণ?—লোকবৃত্ত কি? একটি আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত সমগ্র কার্য। এই কারণেই অর্গানিক ইউনিটির বিচার শেষ পর্যন্ত সমগ্র কার্যের রূপটির বা প্রকৃতির ধারণা বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। মোটকথা এরিষ্টটল অর্গানিক ইউনিটিকে শিল্পের উৎকর্ষ মূল্য হিসাবে গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন রেফারেনশিয়ালিষ্ট কিন্তু যেক্ষেত্রে অঙ্গী বলতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থানের সমষ্টি উপাদানের সন্নিবেশ বিশেষ বুঝায় সেখানে অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক নির্ধারণ এবং সম্পর্কের মূল্য বিচার দুঃসাধ্য এবং এই কারণেই দুঃসাধ্য রূপ যেহেতু এ্যাবসোলিউট রূপাদর্শ ছাড়া রূপ বিচারের কোন মানদণ্ড থাকে না। সংগীতকে যাঁরা 'a set of sounds' এবং সাহিত্যকে 'set of words' হিসাবে দেখেন,—এক কথায় শিল্পের বস্তুসাপেক্ষতা অস্বীকার করেন সেই সব নিরপেক্ষবাদী, অপূর্ববস্তুবাদী বা অবস্তুরূপবাদীরা শিল্পসমালোচনায় অঙ্গাঙ্গিসম্পর্কের বিচারের গণ্ডীর বাইরে যেতে পারেন না এবং পারেন না বলেই শেষপর্যন্ত তাঁদের সামঞ্জস্য, সমতা, পূর্ণতা প্রভৃতি রূপবৈশিষ্ট্যকেই আশ্রয় করতে হয় এবং অঙ্গীর (সমগ্র) ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে অঙ্গবিন্যাসের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করতে হয়। অঙ্গী যদি 'অর্গানিক ইউনিটি' সম্পন্ন কিছু হয়—

হ'তেই হবে—কি প্রক্রিয়ায় এই বৈচিত্র্যের মধ্যে "ঐক্য" গড়ে উঠে বুঝে উঠা শক্ত। লিয়োনার্ড বিঃ মেয়ার তাঁর "ইমোশান এ্যাণ্ড মিনিঙ ইন মিউজিক" (সংগীতে আবেগ ও অর্থ.) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে যা' লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য ; তিনি সমস্যাটি তুলে ধরেছেন এবং লিখেছেন—

The absolutists have contended that the meaning of music lies specifically and some would assert exclusively, in the musical processes themselves. For them musical meaning is non-designative. But in what sense these processes are meaningfull in what sense a succession or sequence of non-referential musical stimuli can be said to give rise to meaning, they have been unable to state with either clarity or precision."—নিরপেক্ষবাদীরা বলেছেন যে সংগীতের অর্থ বিশেষভাবে কারো কারো মতে সম্পূর্ণভাবে, স্বর-যোজনা প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত। তাঁদের মতে সাংগীতিক অর্থ অদ্যোতক কিন্তু কী অর্থে এই স্বরপরম্পরা অর্থবহ হয় কী অর্থে কতকগুলি নিরর্থক সাংগীতিক উদ্দীপকের প্রবাহ বা পর্ব অর্থের দ্যোতনা করে তা তারা স্পষ্টভাবে বা নির্দিষ্টভাবে বুঝাতে পারেননি। স্বরের পরে স্বর যুক্ত করলে যে-কোন স্বর-সমাবেশ তৈরি হতে পারে কিন্তু যে-কোন স্বর-বিন্যাসকেই আমরা সংগীত বলিনে। সংগীত বা রাগ বলি তাকেই যে-স্বরসমাবেশে স্বরগুলি একে অন্যের সঙ্গে এবং সকলে একটি বিশিষ্ট ধাঁচ বা ভঙ্গীর (প্যাটার্ণ) সঙ্গে সমন্বিত। ঐ ধাঁচ বা ভঙ্গীটির ধারণাকে (অঙ্গীর ধারণা) বলা যেতে পারে—"মিউজিকাল আইডিয়া"—যা সংগীতের গঠনটি নিয়ন্ত্রিত করে,—অঙ্গ-যোজনার বা স্বর-বিন্যাসের উৎকর্ষাপকর্ষবিচারে মানদণ্ডের কাজ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে যে অঙ্গী গড়ে উঠে তা রূপবহির্ভূত কোন "**referential concepts, images, experiences and emotional states**" না হ'তে পারে, কিন্তু সে যে একটা 'ধারণা' (আইডিয়া) —রাগের ধারণা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মন যদি বিনা ধারণায় বিচার

করতে না পারে তা হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে—যে ক্ষেত্রে রূপ বাইরের বস্তুকে দ্যোতিত না করে সেক্ষেত্রেও কোন-না-কোন ধারণাকে বা রূপের ধারণাকে প্যাটার্ণকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে এবং ঐ রূপের ধারণাটি এক অর্থে extra-musical' না হ'লেও, অন্য অর্থে 'রেফারেণ্ট' তো বটেই। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক কাণ্ট, তাঁর বিখ্যাত "ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট"—গ্রন্থে বিচার বৃত্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে। কাণ্ট বিচারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—এক "ডিটারমিনাণ্ট" বা অবধারক—যেখানে সামান্য সূত্র আগে থেকেই দেওয়া রয়েছে এবং সেই সূত্র দিয়ে বিশেষের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, সেখানেই বিচার "ডিটারমিনাণ্ট" অন্যপক্ষে রয়েছে—"রিফ্লেকটিভ জাজমেণ্ট" যেখানে বিশেষ দেওয়া থাকে এবং সামান্যকে আবিস্কার করতে হয়। "ডিটারমিনাণ্ট জাজমেণ্ট" বিশেষের মূল্য বিচার করে—বুদ্ধিপ্রদত্ত সার্বজনীন সূত্র দ্বারা। সুতরাং তার অন্য কোন নিয়মের (প্রিনসিপিল্) দরকার হয় না। কিন্তু "রিফ্লেকটিভ" জাজমেণ্ট—যা বিশেষ রূপ থেকে সামান্যের বা সংজ্ঞার স্তরে আরোহণ করে তার স্বতন্ত্র নিয়ম থাকা চাইই চাই। এই নিয়মকে সে অভিজ্ঞতা থেকে ধার করতে পারে না, কারণ তার কাজ সমস্ত বিশেষের নিয়মকে উচ্চতর নিয়মের অধীনে নিয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনা করা। এই নিয়ম (ট্র্যানসেনডেণ্টাল প্রিন্সিপিল)—"The reflective judgment can only give as a law form and to itself" এই নিয়মকে সে অন্য কোন স্থান থেকে পেতে পারে না (পেলে ডিটারমিনাণ্ট হ'য়ে পড়বে) আর প্রকৃতিতেও এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়, কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ধারণাকে প্রকৃতির সঙ্গে মিলতেই হবে।

প্রকৃতির সার্বজনীন সূত্রের জন্মভূমি আমাদের বুদ্ধি (আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং), যা প্রকৃতির ক্ষেত্রে সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করে। Particular empirical laws must be regarded in respect of that which is left undetermind in them by these universal laws, according to a unity

such as they would have if an understanding had supplied them for the benifit of our cognitive faculties, so as to render possible a system of experience according to particular natural laws. This is not to be taken as implying that such an understanding must be actually assumed (for it is only the reflective judgment which avails itself of this idea as a principle for the purpose of reflection and not for determining anything), but this faculty rather gives by this means a law to itself alone and not to nature.

Now the concept of an object so far as it contains at the same time the ground of the actuality of this object is called its end and the agreement of a thing with that constitution of things which is only possible according to ends is called the finality of its form."

মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে "রিফ্লেকটিভ জাজ্‌মেণ্ট" প্রকৃতি বিষয়ে কোন সূত্র প্রয়োগ করতে যায় না, বিশেষের রূপের ক্ষেত্রে সূত্র প্রয়োগ করে এবং সেই সূত্র রূপগত পূর্ণতার সূত্র। কিন্তু রূপের পূর্ণতা বলতে কাণ্ট যা' বুঝাতে চেয়েছেন তা' এই—প্রত্যেকটি বস্তু তার পরিণাম কারণেরই (এণ্ড্) ব্যক্ত রূপ। যখন কোন বস্তুরূপ পরিণাম কারণ-অনুসারী সংগঠনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায় তখনই বস্তুরূপটি পূর্ণতা লাভ করে। বলা বাহুল্য পরিণাম কারণ অনুসারী সংগঠনের ধারণা না থাকলে রূপের পূর্ণতার অপূর্ণতার ধারণা সম্ভব নয় এবং পরিণাম-কারণের জ্ঞানও বস্তুর অভিব্যক্তির অভিজ্ঞতার আগে সম্ভব নয়। এই দিক থেকে রিফ্লেকটিভ জাজ্‌মেণ্টও শেষ পর্যন্ত বস্তুরূপের ধারণা সাপেক্ষ। অবশ্য কাণ্ট পূর্ণতাকে "A particular a priori concept which has its origin solely in the reflective judgment" ব'লে মনে

করেছেন এবং তার ফলে পূর্ণতা একটি ট্র্যানসেনডেন্টাল ধারণায় পরিণত হয়েছে। [A transcendental principle is one through which we represent a priori the universal condition under which alone things can become objects of cognition generally] কাণ্টের এই দুর্বোধ্য চিন্তার জগৎ থেকে বিদায় নেওয়া আমার এবং আপনাদের উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল। তবে একটি কথা মনে রাখলে উপকার হবে যে রূপকে যাঁরা রূপের আদর্শ দিয়ে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করবেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত "পূর্ণতা"কেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন—কেউ হয়তো ভাববাদীর মতো পূর্ণতাকে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ চৈত্তিক উপাদান ব'লে মনে করবেন, কেউ হয়তো বস্তুবাদীর মতো পূর্ণতাকে অভিজ্ঞতালব্ধ সংস্কার হিসাবে গণ্য করবেন।

বক্তৃতার উপসংহারের আগে আমি আর একবার আপনাদের চোখের সামনে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীগুলি অতিসংক্ষেপে উপস্থাপিত করছি এবং শেষে প্রচলিত সমালোচনা পদ্ধতির সামান্য পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১। **বাস্তববাদী দৃষ্টি ভঙ্গিতে** শিল্পের উৎকর্ষ নির্ভর করে যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে, যাথাযথ্যের সঙ্গে কোন বিষয়বস্তুকে অনুকরণ বা সংকেতিত করে তার উপরে। (এই দৃষ্টিভঙ্গীর ত্রুটি কোথায় আগেই দেখানো হয়েছে)।

২। **আবেগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর** দিক থেকে শিল্পের গুণ হ'ল আবেগ বা আনন্দ উদ্রেক করার ক্ষমতা। (ট্র্যানসেনডেন্টালিজিম এই দৃষ্টিভঙ্গীরই রকমফের)

৩। **প্রকাশবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর** মতে শিল্পের উৎকর্ষ নির্ভর করে শিল্পীর মনে প্রতিভাত রূপ কি পরিমাণে শিল্পরসিকের মনে ঐ রূপকে পুনরুদ্বোধিত করতে সক্ষম তার উপরে।

৪। **কনফিগারেশানবাদী দৃষ্টিভঙ্গী** অনুসারে শিল্পকর্মের উৎকর্ষ নির্ভর করে সেই সংহতির উপরে যা শিল্পকে একটা অঙ্গাঙ্গিকযোগযুক্ত সমন্বিত ক্ষেত্রে পরিণত করে।

উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গীর বা ধারণার কোন একটিকে ভিত্তি করে যিনি শিল্পের মূল্য বিচার করতে চেষ্টা করেন, তাঁকেই আমরা সাধারণভাবে সমালোচক আখ্যা দিতে পারি। যিনি কখনও একটি, কখনও অন্য একটি মানদণ্ড ব্যবহার করেন—পূর্বে যে সকল মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছি তাদের ভিতর থেকে কোন একটিকে সত্য ব'লে গ্রহণ ও প্রতিপালন না ক'রে সমালোচনায় অগ্রসর হন তাঁকে আর যাই বলা যাক যথার্থ সমালোচক বলা চলে না। সমালোচনা যেহেতু শিল্পের মূল্যায়ন এবং বিনা মানে মূল্য বিচার সম্ভব নয়, সমালোচকের প্রথম কাজ মূল্য-মান নির্ধারণ করে নেওয়া। গোড়াতেই বলা হয়েছে—এবং বহুবার বলা হ'য়েছে, মূল্যমান নির্ধারণ শেষ পর্যন্ত শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণের উপরেই নির্ভর করে এবং সংজ্ঞাটি যত দোষমুক্ত হয়, মূল্যায়ন তত যথার্থ হয়ে উঠে। বাস্তবিকই, যে কোন একটি সংজ্ঞা গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, যে সংজ্ঞাটি গৃহীত হ'ল তা' অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি দোষমুক্ত কি না সেইটিই প্রথম বড় বিচার্য বিষয়। যুক্তিসিদ্ধ সংজ্ঞা গ্রহণের পরে সমালোচকের প্রধান কাজ মূল সূত্র ও অনুসিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগ।

এই কাজটি যে সহজসাধ্য নয়, যথার্থ সমালোচকের সংখ্যাল্পতা দেখলেই বুঝা যায়। শিল্প বহু অংশের সংযোগে উৎপন্ন একটি অংশী বা সমগ্র বস্তু। প্রত্যেক সমগ্র বস্তুর মতোই, অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক—এবং পারম্পর্য, আভ্যন্তরীণ কোন কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ আভ্যন্তরীণ "কোন কিছু" বা ভাব এবং বাহ্যিক 'রূপ' এই দুইয়ের নিখুঁত ঐক্য স্থাপিত হয়েছে কি না এবং প্রতিটি উপাদান যোজনা সমুচিত হয়েছে কি না তা' বিচার করা যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার "অর্গানিক ইউনিটি" নিরূপণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্রকে এক দৃষ্টিগ্রাসে গ্রহণ করা (সাইনোপটিকভিশান) বহুশিক্ষাভ্যাস সাপেক্ষ ব্যাপার এবং মনকে যুগপৎ সমগ্রের কোটিতে এবং অংশের কোটিতে দোলায়িত করা তথা অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কের যথার্থ রূপটির ধারণা করা খুবই কঠিন এবং অনুশীলন সাপেক্ষ ব্যাপার। এর জন্য চাই—বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণপটুতা, বিশ্লেষণ নিপুণতা,

শ্রেণীবিভাজন ক্ষমতা ও সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ দক্ষতা, বিচারকের নিরপেক্ষদৃষ্টি, সূত্রপ্রয়োগপটুতা, প্রমাণসংগ্রহিষ্ণুতা রসিকের প্রতিভানদক্ষতা, সহৃদয়তা বা তন্ময়ীভবনযোগ্যতা এবং দার্শনিকের তত্ত্বদর্শিতা এবং বহুশাস্ত্রজ্ঞতা। এতগুলি গুণের সমাবেশ ঘটলে তবেই সমালোচক কৃতীসমালোচক হ'তে পারেন।

কিন্তু আদর্শ সমালোচকের সংখ্যা যত কমই হোক, সমালোচনা অর্থাৎ মূল্যাবধারণের প্রবৃত্তি বলা যেতে পারে সার্বজনীন। ইন্দ্রিয়োপলব্ধ বিষয় বা প্রতীতি সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক হ'ল এ সম্বন্ধে মন্তব্য আদিম যুগ থেকেই চলে আসছে। যা' দেখতে আনন্দ হয় তাকে বৈদিকযুগের মানুষ 'সুদৃশ' বলেছে, যা' শুনতে আনন্দদায়ক তাকে 'সুশ্রব' বলেছে। পরবর্তীকালে সুদৃশ 'রম্য' আখ্যা এবং সুশ্রব 'মধুর' আখ্যা পেয়েছে এবং ক্রমে সমস্ত 'সু'-প্রতীতি "সুন্দর" পদবাচ্য হয়েছে। লৌকিক প্রতীতিকে যেমন সুন্দর-অসুন্দর এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, শৈল্পিক প্রতীতিকেও তেমনি সুন্দর-অসুন্দর বলে মূল্যাঙ্কিত করা হয়েছে। এই শেষোক্ত মূল্যায়নকেই আমরা সমালোচনা বলে থাকি। অবশ্য নিছক সুন্দর বা অসুন্দর বলে অভিমত প্রকাশ করাকেই আমরা সমালোচনা বলিনে। অভিমতকে যখন যুক্তি দিয়ে, বিস্তারিত করা হয়—সমগ্র প্রতীতিকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও উপাদানে বিশ্লেষিত করে, সমগ্রের সঙ্গে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অন্বয় বা সম্পর্কটি যথাযথ হয়েছে কি না, বা উপাদান-যোজনা সমুচিত হ'য়েছে কি না তা' বিচার করা হয়, শুধু তখনই আমরা অভিমতের প্রকাশকে সমালোচনা বলে গণ্য করে থাকি। এ কথা আগেই বলা হয়েছে—শিল্পসমালোচনার মুখ্য প্রবৃত্তি শিল্পের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা থেকেই জন্মে থাকে এবং বাহুল্য হলেও এ কথাটি আর একবার বলা দরকার—বস্তুবাদীরা বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রেখে শিল্পের রূপমূল্য বিচার করবেন, ভাবাবেগবাদীরা ভাবব্যঞ্জকতার দিকে দৃষ্টি রেখে শিল্পরূপের মূল্য বিচার করবেন, কল্পনাবাদীরা—বিশেষতঃ যাঁরা নিরপেক্ষবাদী—শিল্পে কল্পনা বৈভব কতখানি কি আছে না আছে—কল্পনাবৃত্তিকে তা' কতখানি চরিতার্থ করে না

করে তাই হিসাব করে শিল্পমূল্য নিরূপণ করবেন। কেউ যদি অলংকারবাদীদের মতো কাব্যকে অলংকৃত বাক্য ব'লে সিদ্ধান্ত করেন, তা' হ'লে অলংকারকেই লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে, আর সবই অর্থাৎ বিষয়বস্তু হবে উপলক্ষ্য। তেমনি কেউ যদি—রীতিবাদী হন তা' হ'লে তাঁকে রীতিকেই—অবয়বসংস্থানকেই কাব্যমূল্য ব'লে স্বীকার করতে হবে এবং রীতিগত দোষগুণ বিচারের মধ্যে সমালোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এমনি ক'রে যিনি যে মূল্যকে কাব্যের বৈশেষিক লক্ষণ ব'লে মনে করবেন সেই মূল্যের সদ্ভাব-অসদ্ভাব হিসাব ক'রেই তাঁকে সমালোচনা-কার্য সম্পাদন করতে হবে। রসবাদীরা, স্থায়িভাবের অভিব্যক্তির জন্য বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের সমুচিত সংযোগ সাধিত হয়েছে কি না তা' বিচার করবেন, ধ্বনিবাদীরা ধ্বনির অর্থাৎ ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষমতার পরিমাপ করবেন, রম্যার্থবাদীরা রম্যতা বা সৌন্দর্য শিল্পবস্তুর লোকোত্তরাহ্লাদজনকতা বিচার করবেন, এবং শব্দার্থবাদীরা শব্দের ও অর্থের সাহিত্য বা সম্পৃক্তি কতখানি কি হয়েছে বা না হ'য়েছে তা' নিরূপণ করতে চেষ্টা করবেন। মোটকথা দাঁড়াচ্ছে এই যে বিচার বা সমালোচনা ধারণাসাপেক্ষ এবং বিশেষ বিশেষ ধারণা বা সংজ্ঞা অনুসারেই সমালোচকরা দোষ-গুণের ধারণা বা সমালোচনা করে থাকেন—এবং তদনুসারেই শিল্পবস্তুর দোষগুণ বিচার ক'রে থাকেন।

প্রাচীন যুগের সমালোচনায় বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই যে প্রাধান্য ছিল এ কথা বিশেষভাবে বলার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে আমি মনে করিনে। এ কথাও বলা বাহুল্য, শিল্পবস্তুটিকে একক ও সমগ্র ব'লে মনে করায়, বাস্তববাদী সমালোচনা শেষ পর্যন্ত 'অর্গানিক ইউনিটি'র বিচারে, তথা ঔচিত্য-বিচারে (শব্দার্থের, ঘটনার এবং চরিত্রের) পরিণত হ'য়েছিল। এমন কি ভাবাবেগবাদী বা রসবাদী সমালোচনাও মূলতঃ বাস্তববাদী, যেহেতু সাপেক্ষবাদী অর্থাৎ ভাবের ধারণানুসারে রূপের বিচার। বাস্তববাদী সমালোচনা খুব স্বাভাবিক-ভাবেই "ঐতিহাসিক সমালোচনা"র এবং "রূপতাত্ত্বিক সমালোচনা"র

বিস্তার লাভ ক'রে থাকে। ঐতিহাসিক সমালোচনাপদ্ধতি শিল্পীর মনকে ও শিল্পবস্তুকে দেশ-যুগ-কালসাপেক্ষ বলে স্বীকার ক'রে নেয় এবং শিল্পবস্তুটিকে ঐতিহাসিক বস্তু হিসাবেই গণ্য করে থাকে। ঐতিহাসিক সমালোচকদের কাছে—শিল্পিমানস যেমন দেশ-যুগ-কালের নিয়ন্ত্রণে গঠিত, শিল্পবস্তুটিও শিল্পিমানসের সঙ্গে কার্য-কারণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। শিল্পীর মনটি যেমন সমাজবিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ের বস্তু হিসাবে ঐতিহাসিক পরিণাম—শিল্পবস্তুটিও সেই শিল্পী-মনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি—যে শিল্পী সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে অন্য সামাজিকের কাছে তাঁর উপলব্ধিকে প্রকাশ তথা প্রচার করতে চায়। এঁদের বিশেষ বক্তব্য এই যে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রেখেই শিল্পের, ভাবের ও রূপের বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হবে। এই সমালোচনা-পদ্ধতির উৎস খুঁজতে গিয়ে পণ্ডিতরা ভিকোর "লা সায়েঞ্জা নুয়োভা" (নব বিজ্ঞান—১৭২৫) গ্রন্থে পৌঁচেছেন এবং দেখেছেন—ভিকোর পরে জার্মানীর হার্ডার পদ্ধতিটিকে বিস্তারিত করেছেন এবং তেইনে পদ্ধতির সূত্র রচনা করেছেন। তেইনের মতে শিল্পকর্মের স্বরূপ বুঝতে হ'লে—শিল্পকে জাতি যুগ এবং মুহূর্তের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে পর্যালোচনা করতে হবে। এই পদ্ধতিটি এখন সুপ্রচলিত—যদিও কলাকৈবল্যবাদীরা তেমন সুনজরে একে দেখেন না এবং এর প্রাদুর্ভাব দেখে মনঃক্ষোভ প্রকাশ ক'রে থাকেন। তাঁদের ক্ষোভের বিশেষ কারণ এই যে এই পদ্ধতি একবার মেনে নিলে, এরই বৈজ্ঞানিকতার রূপ মার্কসীয় সমালোচনা পদ্ধতিকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হবে। মার্কসীয় সমালোচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব ; তার আগে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই।

ঐতিহাসিক সমালোচনা যেমন জাতি-যুগ-মুহূর্তের বা বিশেষ সময়ের ইতিহাসের উপরে গুরুত্বারোপ করে, শিল্পসৃষ্টিতে সমাজের প্রেরণাকে বড় স্থান দেয়, মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা তেমনি, ব্যক্তির জৈবিক প্রবৃত্তির মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা খুঁজতে চেষ্টা করে। এই গোষ্ঠীর সমালোচকরা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের উপরে আস্থা স্থাপন করে শিল্পকে দিবাস্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন এবং মনে করেন স্বপ্নের

মধ্যে যেমন ব্যক্তির অবদমিত বাসনা-কামনা রূপকাকারে ব্যক্ত হয়' শিল্পেও তেমনি শিল্পীর এবং শিল্পীর সমপর্যায়ভুক্ত শিল্পরসিকদের অবদমিত বাসনা চরিতার্থ হ'য়ে থাকে। শিল্প এঁদের কাছে—'substitute-gratification, পরিবর্ত বা পরোক্ষ সম্ভোগ। এই সংস্কার নিয়ে যাঁরা শিল্পসমালোচনায় অগ্রসর হবেন তাঁরা যে শিল্পের মধ্যে অবদমিত বাসনার রূপ ও রূপক সন্ধান করবেন এ কথা বলাই বাহুল্য। লুকাস-রচিত "মনস্তত্ত্ব এবং সাহিত্য" গ্রন্থখানি পাঠ করলেই এই শ্রেণীর সমালোচকের ও সমালোচনার সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যাবে। (হ্যামলেট ও ম্যাকবেথ চরিত্র বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য)।

শিল্পকে যাঁরা পরিবর্ত-সম্ভোগ বলে মনে করেন তাঁদেরই সমগোত্রীয় হচ্ছেন সেই সব মনস্তত্ত্বরসিক সমালোচক যাঁরা শিল্পকে—'অভাব-পূরণ' (Compensation) বলে গণ্য করে থাকেন। শিল্পীরা শিল্পের মধ্যে নিজেদের অভাবকেই অর্থাৎ যা তাঁরা হতে পারেননি অথচ যার জন্য তাঁদের মনের তলদেশে গোপন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে,—সেই আকাঙ্ক্ষাকেই পরোক্ষভাবে শিল্পে প্রকাশ করে থাকেন। এই ধারণা যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা শিল্পের অভাবপূরণ সামর্থ্যের পরিমাপ করবেন এটাই প্রত্যাশিত। মনস্তত্ত্বরসিকদের আর এক শ্রেণী —যাঁরা শিল্পকে ভাবমোক্ষক বা আবেগ-রেচক (cathartic) বলে মনে করেন। এঁদের মতে, সামাজিক মানুষের মধ্যে আবেগানুভূতি প্রচুর পরিমাণে জমে থাকে এবং তা ব্যক্ত করার সুযোগ তারা খুব কমই পায়। নিজেকে হাস্যাস্পদ না করে অথবা অসুবিধায় না ফেলে ঐ সব আবেগ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। শিল্প সেই সুযোগ দেয়। শিল্পসম্ভোগকালে সামাজিক মানুষ বাস্তব পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় এবং কাল্পনিক পরিস্থিতির সুযোগে অবদমিত আবেগকে মন থেকে বের করে দেয়। এই শ্রেণীর সমালোচক শিল্পের আবেগ-রেচন ক্ষমতাকে মূল্য হিসাবে গ্রহণ করেন এবং যে পরিমাণে শিল্প ভাবাবেগ উদ্রিক্ত করে সেই পরিমাণে শিল্পকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় সমালোচনা শিল্পবস্তুটির গঠন-সৌন্দর্যের পর্যালোচনা—অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিসম্পর্কের সমীক্ষণ নয়

এবং তা নয় বলেই অধিক পরিমাণে ব্যক্তিপ্রমাণ নির্ভর। দেখা যায়, ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে একমাত্র ভিত্তি করে আর একশ্রেণীর সমালোচনা গড়ে উঠেছে। এই শ্রেণীকে বলা হয়েছে—ইম্প্রেশানিষ্টিক ক্রিটিসিজিম। কোন একটি শিল্প প্রত্যক্ষ করার পরে সমালোচক যখন নিজ অনুভূতিকে আর দশজনের কাছে লিখিত রূপে প্রকাশ করেন, শিল্পরূপটিকে তার নিজের মনে যে-ভাবে প্রতিভাত হয়েছে, সেই রূপটিকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন, তখনই সমালোচনা ইম্প্রেশানিষ্টিক হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে একটি কথা আছে—"কবিতারসমাধুর্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ। অর্থাৎ কবিতার রসমাধুর্য কবিই জানেন কবিতাখানি যিনি রচনা করেন সেই কবি জানেন না। এই কথাটির তাৎপর্য এই যে রসিক হ'তে পারেন তিনিই যিনি নিজেই ভিতরে ভিতরে কবি—কবিসহৃদয়। তাই সমালোচক নিজে শিল্পী না হ'লে "ইম্প্রেশানিষ্টিক ক্রিটিসিজিম" সম্ভব হয় না। তবে সমালোচকের শিল্পসত্তা যদি সমালোচকের বস্তুনিষ্ঠার গণ্ডী অতিক্রম করে, শিল্পবস্তুকে উপলক্ষ করে নিজের আবেগ অনুভূতিকে বিস্তার করতেই মেতে উঠে, সমালোচনা নতুন সৃষ্টির মহিমা লাভ করে বটে কিন্তু যথার্থ সমালোচনার গৌরব হারিয়ে ফেলে। এই জাতীয় সমালোচনা যতখানি সমালোচকের আত্মজীবনী ততখানি সমালোচনা নয়। এতে নতুন সৃষ্টির আস্বাদ পাওয়া যায়, একথা সত্য, কিন্তু সমালোচনায় শিক্ষার্থীর কোন উপকার হয় না; কারণ ইম্প্রেশানিষ্টিক ক্রিটিসিজিম সমালোচনায় এমন কোন সূত্র বাতলে দেয় না, যে সূত্র প্রয়োগ করে শিল্প-সমালোচনায় ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়।

প্রতিভানবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে সমালোচনা করতে হবে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং প্রতিভানবাদী সমালোচনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছি। শিল্পীর প্রতিভানকে সমালোচক যত যথাযথভাবে মনে গ্রহণ করতে, পুনরুদবোধিত করতে সমর্থ হবেন এবং কল্পনাদর্শ দিয়ে প্রতিবোধিত রূপের মূল্য যাচাই করতে পারবেন তত তার সমালোচনা সার্থক হবে। এ ক্ষেত্রেও সমালোচনায় কোন নির্দিষ্ট সূত্র

পাওয়া যায় না—যদিও প্রতিভানবাদী সমালোচনা পুরোদস্তুর ইম্প্রেশানিষ্টিক সমালোচনা নয়। 'ফর্ম' এবং 'কনটেন্ট'এর সম্পর্ক নির্ধারণে প্রতিভানবাদীরা 'ফর্ম' বা রূপকেই 'কৈবল্য' বলে মনে করেন, বিষয়বস্তুর গুরুত্ব লঘু করে দেখেন এবং এই সত্যকেই এড়িয়ে যেতে চান যে বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যই শেষপর্যন্ত রূপকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

ঐতিহাসিক সমালোচকদের মতোই মার্কসীয় সমালোচকরা বিষয়বস্তু এবং রূপ উভয়কেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং এই ধারণাই পোষণ করেন যে শিল্প যেহেতু কল্পনাকারে পরিবেশনেরই প্রতিফলন, শিল্পের রূপ বিষয়বস্তুরই কল্পরূপ এবং ঐ রূপ শুধু জাতি-যুগ-মুহূর্তের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়, একটি আর্থ নৈতিক ভিত্তির সঙ্গেও সংযুক্ত। শিল্প সমাজের উপরিতলের প্রকোষ্ঠের সামগ্রী বটে, কিন্তু উপরি-তলের প্রকোষ্ঠটি যেহেতু একটি বিশেষ আর্থ নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং ভিত্তির সঙ্গে উপরিতলের যোগ অপরিহার্য শিল্প বাস্তবকে প্রতিফলিত না ক'রে পারে না। ঐতিহাসিক সমালোচকের সঙ্গে মার্কসবাদী সমালোচকের মৌলিক পার্থক্য এই যে ঐতিহাসিক সমালোচক যেখানে সাধারণভাবে জাতি-যুগ-সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পবস্তুটির সম্পর্ক নিরূপণ করতে চেষ্টা করেন, মার্কসবাদী সমালোচক সেখানে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আদিম-সমাজ, দাস-সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক-সমাজ, পুঁজিতান্ত্রিক-সমাজ, সমাজতান্ত্রিক-সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক দেখিয়ে, শিল্পরূপটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে থাকেন। শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ বা রূপ রচনা এ কথা মার্কসবাদীরা অবশ্যই স্বীকার করেন—স্বীকার করেন শিল্প "reflects reality not in concepts but in a concrete form perceivable by the senses in the form of typical artistic images এবং এই স্বীকৃতিরই অনিবার্য সিদ্ধান্তও মানেন—মানেন—"The more vivid the more tanigible the individual traits of the artistic image the greater its attraction and influence"

—(Marxist philosophy by V. Afanasyev) কার্ল মার্কস ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস্ যখন সাহিত্য সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতেন তখন—বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেমন তেমনি রূপেরও দোষগুণ নিয়ে—শিল্পের প্রভাবমূল্য নিয়েও, আলোচনা করতেন। মোট কথা মার্কস-এঙ্গেলস্ সমাজ বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে আর্থ নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে সমাজকে, ব্যক্তিকে, ব্যক্তির ধারণা ও ভাবাবেগ প্রভৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন বলেই যেমন শিল্পের বিষয়-বস্তুর প্রকৃতিটিকে স্পষ্টতর দৃষ্টিতে দেখতেন, তেমনি শিল্প রূপটির বিষয়বস্তুর প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতেন—অঙ্গীর সংগে অঙ্গের সম্পর্কের সঙ্গতি বিচার করতেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—মার্কসবাদী সমালোচনা শিল্পের বিষয়বস্তু ও রূপ, আত্মা ও দেহ দু'টোর দিকেই সমান দৃষ্টি রাখে এবং বাস্তব-জীবনের সঙ্গে শিল্পীর ও শিল্পের সম্পর্ককে অধিকতর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা ক'রে। যে কথা বললে অত্যুক্তি হবেনা সেই কথাটি বলেই আমি বক্তৃতার উপসংহার করছি।

মার্কসবাদী সমালোচনায় ঐতিহাসিক এবং নির্মিতিবাদী (কনফিগারে-শানাল) সমালোচনা পূর্ণতার দিকে আরো অনেক ধাপ এগিয়ে গেছে। অতিজাগতিক সত্তাবাদকে দৈববাদকে অথবা ভাববাদকে যদি আমরা সত্য বলে স্বীকার না করি, যদি বস্তুবাদকে—বিশেষতঃ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে মূল পরম সত্য হিসাবে গ্রহণ করি, তা'হলে শিল্পদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও তার প্রভাব অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে এবং তখন শিল্পদর্শনেও মার্কসবাদী সিদ্ধান্ত ও শিল্পসমালোচনায় মার্কসীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।